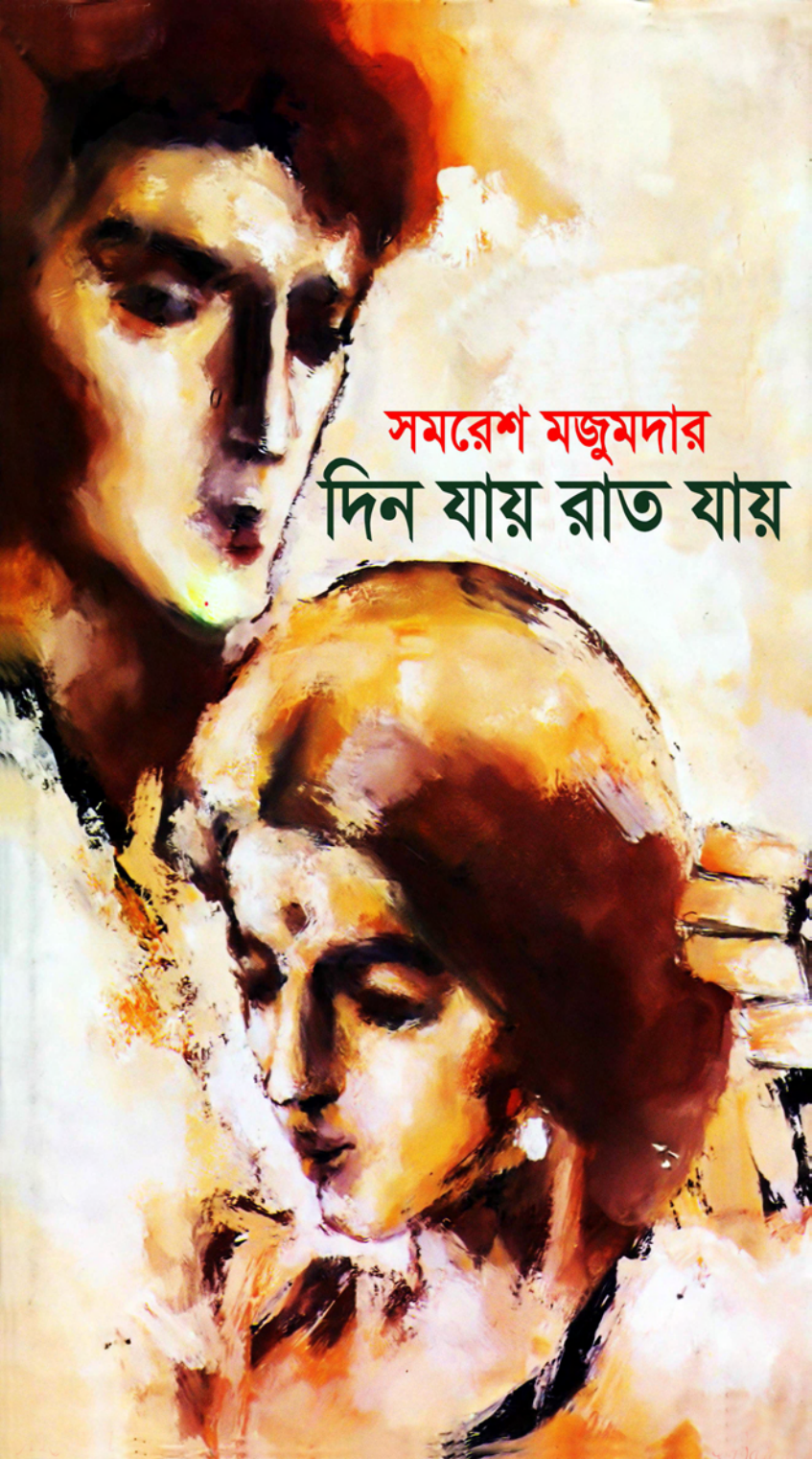
সমরেশ মজুমদার
দিন যায় রাত যায়

অন্য সকলের থেকে একটু আলাদাই ছিল তিস্তা। কানপুরের মিশনারি স্কুলে পড়াশোনা, বাবার অভিজ্ঞ, দূরদর্শী পরামর্শ ছোট্টবেলা থেকেই সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলতে শিখিয়েছিল তাকে। বাবাই তিস্তাকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্সিতে। ইংরেজিতে অনার্স। বাবার খুব শখ ছিল, মেয়ে ইংরেজিতে এম. এ. করে কলেজে পড়াবে। সাহিত্য নিয়ে রিসার্চ করে নামের আগে অর্জন করবে ডক্টরেট ডিগ্রি। ইংরেজি সাহিত্য তিস্তারও প্রিয় বিষয়। বাবার ইচ্ছের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল মেয়ের নিজেরও ইচ্ছে।

কিন্তু অন্য সকলের থেকে আলাদা তিস্তার জীবনটাও যেন হয়ে গেল একেবারে আলাদা রকমের। জীবনের প্রথম ভুল তিস্তাকে ঠেলে দিল নতুনতর ভুলের দিকে। তিস্তার জীবন যেন ধারাবাহিক ভুলেরই জীবন। বঞ্চনা ও প্রবঞ্চনার জীবন।

কেন এমন হয়? কেন একটি মেয়েই বারবার হবে সর্বস্বান্ত? কেন জীবনশুরুর স্বপ্নের সঙ্গে এত অমিল পরবর্তী জীবনপ্রবাহের?

তিস্তার আশ্চর্য জীবনকাহিনীর মধ্য দিয়ে এমনই নানান অমোঘ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন সমরেশ মজুমদার।

ISBN 81-7215-150-0

দিন যায় রাত যায়

সমরেশ মজুমদার

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৩ থেকে **দ্বিতীয় মুদ্রণ** মে ১৯৯৪ পর্যন্ত
মুদ্রণ সংখ্যা ৬৩০০
তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ১৯৯৭ **মুদ্রণ সংখ্যা** ৩০০০

ISBN 81-7066-150-0

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৩০.০০

দিন যায় রাত যায়

শেয়ালদা স্টেশনে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল তিস্তা। গিজগিজ করছে মানুষ। এখন পাঁচটা বেজে তিরিশ, কোন প্লাটফর্মেই ট্রেন নেই, হাওয়ায় ফোলা মশারির মত মানুষের দঙ্গল টলটল করছে। নিঃশ্বাস ফেলল তিস্তা, হয়ে গেল আজ!

ভিড় যতটা বাঁচানো সম্ভব, এক কোণে ব্যাগটাকে বুকের ওপর চেপে দাঁড়িয়ে রইল সে। এখন কাউকে জিজ্ঞাসা করলে যে কটা উত্তরের একটা পাওয়া যাবে তা এতদিনে জানা হয়ে গিয়েছে। হয় তার ছিঁড়েছে, নয় কোথাও অ্যাকসিডেন্ট এবং অবরোধ হয়েছে, না হলে হকারদের সঙ্গে রেলের লোকের গোলমালের পরিণতি এটা। পাঁচ মিনিটেও যখন মাইকে কোন অ্যানাউন্সমেন্ট শোনা গেল না তখন বোঝাই যাচ্ছে যে কোন গোলমালের শিকার হয়েছে রেলের লোক।

সময় যত যাচ্ছে তত ভিড় বাড়ছে। ওদিকে বনগাঁ হাবড়া এদিকে নৈহাটি রাণাঘাট, সেইসঙ্গে ডানকুনির প্যাসেঞ্জারদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। প্রতিদিন ঠিক সময়ে কলকাতা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায় এরা, সময়ে বাঁধা ট্রেনগুলোকে না পেয়ে হতভম্ব অবস্থা। কোণে সরে দাঁড়ালেও ভিড় একসময় তিস্তাকে গ্রাস করে নিল। লোকাল ট্রেনের প্যাসেঞ্জার হলে তোমার আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। কাছে দাঁড়ানো দুজন শীর্ণ চেহারার মহিলা কথা বলছিলেন, 'কি হবে ভাই সাতটার মধ্যে না গেলে মেয়েটা একা হয়ে যাবে। কাজের লোকটা তারপর থাকতে চায় না।'

'তোমাদের পাড়াটা কি খারাপ?' দ্বিতীয় জন প্রশ্ন করল।

'কোন পাড়া ভাল বল। উঠতি বয়সের মেয়ে সন্ধেবেলায় একা বাড়িতে থাকলে কখন কি হয়ে যেতে পারে। দেরি হলে আমার শরীর খারাপ লাগে তাই!'

'ওর বাবা তাড়াতাড়ি ফেরে না?'

'হুঁঃ। পেটে ধরেছিলাম যখন তখন আগলাবার দায়িত্ব আমার। তিনি অফিসে তাস পিটিয়ে বাড়ি ফেরেন এগারটায়। ইছাপুরের বাপের ভিটে ছেড়ে আসবেনও না।'

তিস্তা অন্যদিকে তাকাল। চারপাশে যত মানুষ তাদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু সমস্যা আছে। মেয়েদের যেন একটু বেশী। কলকাতায় চাকরি করতে আসা মেয়েদের সংখ্যা যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। আগে সাধারণ কম্পার্টমেন্টে ওঠার সময় ভিড় ঠেলতে হত, এখন মেয়েদের কম্পার্টমেন্টে পা রাখতে হলে মারপিট করতে হয়। এইসময় শেয়ালদা থেকে বসার কথা স্বপ্নের মত, বিশেষ করে অফিসের সময়। সবাই উল্টোডাঙ্গা থেকে জায়গা দখল করে

আসে। হাতের মুঠোয় ধরা রুমালটা ভিজে গেছে। দুদুটো রুমাল নিয়ে রোজ বের হয় তিস্তা। দুটোই নোংরা হয়ে ফেরে। এখন কি করা যায়। বাস ধরে শ্যামবাজার, সেখান থেকে আঠাত্তর নম্বর বাসে চেপে বারাকপুর, সেখান থেকে অটোয় চেপে নোনাচন্দনপুকুর। ব্যাপারটা ভাবলেই মরে যেতে ইচ্ছে করে। ট্রেন স্বাভাবিক থাকলে অবশ্য কিছু নয়। বাড়ির সামনে থেকে রিক্সা বা অটোয় স্টেশন, সেখান থেকে বারাকপুর লোকাল ধরলে শেয়ালদা পঁচিশ মিনিট। হুস করে চলে আসা। কোমরে অস্বস্তি হতেই কাপড়টাকে আর একটু ঝুলিয়ে দিল সে।

হঠাৎ চেঁচামেচি শুরু হল। কিছু ছেলে ট্রেন ছাড়ার জন্য দাবী জানাচ্ছে। প্লাটফর্মেই যেখানে ট্রেন নেই সেখানে ট্রেন ছাড়বে কি করে কে জানে! কিন্তু ছেলেগুলোর সঙ্গে বয়স্করাও জুটে গেলেন। ক্রমশ উত্তাপ ছড়াতে লাগল। স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্টের ঘরের সামনে বিক্ষোভ পৌঁছে গেল। পাশাপাশি কিছু লোক ট্রেনের নাম লেখা বোর্ডগুলো ভাঙতে লাগল। প্লাটফর্মের ওপরে টাঙানো টিভি মনিটরগুলো চুরমার হতেই মানুষজন প্লাটফর্ম ছেড়ে পালাতে লাগল। এখনই পুলিশ আসবে, লাঠি চার্জ হবে, টিয়ার গ্যাস ছুঁড়বে।

জলস্রোতে ভাসা কুটোর মত তিস্তা ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের কাছে চলে আসতে বুঝতে পারল ভেতরে মারপিট শুরু হয়ে গেছে। এখন ছটা, রাত দশটার আগে শান্তি ফিরে আসার কোন সুযোগ নেই। এমন সময় পাশে দাঁড়ানো এক যুবক জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবেন?'

অনেকসময় এইরকম গোলমালের দিনে কিছু প্যাসেঞ্জার জোট বেঁধে ট্যাক্সি ভাড়া করে যায়। তিস্তার মনে হল যুবকের উদ্দেশ্য সেইরকম হতে পারে। সে বলল, 'বারাকপুর।'

'তাহলে এখন যাওয়ার চিন্তা করে লাভ নেই। যুবকটি হাসল, 'চলুন কোথাও চা খাওয়া যাক'।

তিস্তা গম্ভীর চোখে যুবককে দেখল। বড়জোর তিরিশ। সঙ্গে সঙ্গে আর এক বাস্তবে ফিরে এল সে। এই কলকাতার রাস্তায় এইসব কথা এতবার শুনতে হয়েছে যে এখন আর চমক লাগে না। সে চোখ না সরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কিসে মনে হল আপনি বললে চা খেতে যাব?'

'না, একা দাঁড়িয়ে আছেন, তাই বললাম।' যুবক স্মার্ট হবার চেষ্টা করল।

তিস্তা মুখ ফিরিয়ে এক ঝলক দেখে নিয়ে বলল, 'আসুন।'

যুবক নড়ল না, 'মানে?'

'আসুন না।' তিস্তা হাসার চেষ্টা করতে যুবক যেন ভরসা পেল। সে তিস্তার পাশে হাঁটতে লাগল। কয়েক পা যেতেই তিস্তা দাঁড়িয়ে গেল। কালো, খুব রোগা, ঘর্মাক্ত এক প্রৌঢ়া মহিলা স্টেশনের ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর সামনে গিয়ে তিস্তা যুবককে বলল, 'এঁকে ওই প্রস্তাব দিন!'

যুবক হতভম্ব, 'তার মানে!'

তিস্তা এবার অবাক হওয়া মহিলাকে বলল, 'দেখুন, আমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম। এই লোকটি আগবাড়িয়ে কথা বলে আমাকে চা খাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। আপনি কিছু মনে করবেন না, ওকে আপনার কাছে একই

প্রস্তাব দিতে বলছি।'

যুবক বলল, 'আশ্চর্য! কাকে কি বলব সেটা আপনি ঠিক করবেন?'

'তাহলে আপনাকে বলতে হবে আমাকে কেন ওই প্রস্তাব দিয়েছেন?'

'ঠিক আছে, সরি!' যুবক চলে যাওয়ার চেষ্টা করতেই তিস্তা তার পথ আগলালো, 'উহুঁ। লেজ গুটিয়ে চলে যাওয়া চলবে না। আপনার বয়স কত?'

'কেন?' যুবক এবার ভয় পেল।

'আমার পঁয়ত্রিশ। এই সমস্ত ফাজলামি বন্ধ করুন।'

ইতিমধ্যে শ্রোতার সংখ্যা বেড়ে গেছে। গায়ে পড়ে কেউ কেউ কারণ জানতে চাইছে। তিস্তা এই জনতাকেও চেনে। সে যুবককে ধমকালো, 'যান।'

বলামাত্র যুবক প্রাচী সিনেমার দিকে হাঁটতে লাগল। তাকে চলে যেতে দেখে ভিড় আলগা হল। মহিলা এতক্ষণ পুতুলের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার বললেন, 'কি দিন পড়ল। অবশ্য স্টেশনে এত খারাপ মেয়ের ভিড় যে ভাল মেয়েদের ওরা খারাপ বলে ভুল করে। তবে আমাকে কোনদিন কেউ ওসব বলেনি, জানেন!'

তিস্তা কিছু না বলে সরে আসতেই প্লাটফর্মের ভেতর থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল। আরও কিছু লোক প্রাণভয়ে ছুটে এল বাইরে। গাড়িগুলো পালাচ্ছে যে যেমন পারে। তিস্তা কোনরকমে ভিড়ের ধাক্কা সামলে প্রাচী সিনেমার সামনে চলে এল। এত মানুষ চারপাশে ত্রাস্ত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও ওর কানে একটু আগে শোনা মহিলার কথাগুলো বেজে যাচ্ছিল। আমাকে কোনদিন কেউ ওসব বলেনি, জানেন! বলার ধরনে যতখানি গর্ব তার অনেকবেশি আফশোষ ছিল না তো! কোথায় পড়েছিল যেন, পুরুষের স্বভাব হল সুন্দরী মেয়ের সান্নিধ্য চাওয়া। যে পুরুষ চায় না তার ব্যবহারের সবটাই যেমন স্বাভাবিক নয় তেমনি যে নারীর দিকে পুরুষের ভ্রূক্ষেপ নেই তার কোথাও খামতি আছে।

কপালে পড়ে আসা চুল সরাল তিস্তা। মাঝে মাঝে মনে হয় ঈশ্বর তার মধ্যে কেন কিছু খামতি দিলেন না। এই পঁয়ত্রিশেও সে এমন ভরাট সুন্দর কেন? আজকাল চোখের তলায় মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত ভাঁজ পড়ে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দিন হলে ভাঁজটা বোঝা যায়। ভাল করে ক্রীম মালিশ করলে ধীরে ধীরে সেটা মিলিয়ে যায়। কিন্তু তিস্তা জানে এটা সতর্কীকরণ। এবার সময় হচ্ছে বয়সের জানান দেওয়ার। না, শরীরে তার বাড়তি চর্বি নেই একটুকুও। তলপেটে একটু ভার ঠেকলেই আসন বাড়িয়ে দেয়।

হঠাৎ চোখের সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। প্যাসেঞ্জার টাকা বের করতেই সে বৃদ্ধ সর্দারজীকে বলে ফেলল, 'যাবেন?'

'বসুন!'

সঙ্গে সঙ্গে দূরে দাঁড়ানো জনস্রোত ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্যাক্সিটার ওপরে। ট্যাক্সির হাতল আঁকড়ে কোনরকমে দাঁড়িয়ে ছিল তিস্তা। সর্দারজী কাউকে নেবে না। তার বক্তব্য এই দিদিকে আগে কথা দেওয়া হয়ে গেছে। তিস্তা

কোনমতে ভেতরে উঠতে পারল। এবার অনেকেই তাকে অনুরোধ করতে লাগল সঙ্গী করে নেবার জন্যে। অদ্ভুত লাগছিল তিস্তার। সে কোথায় যাবে না জেনেই লোকগুলো সঙ্গী হতে চাইছে। এখনকার কলকাতার মানুষদের আচরণ কোনভাবেই বোঝা যায় না। সর্দারজী ট্যাক্সি চালু করে জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন, কোথায় যাবেন ? আপনার বাড়ি কোথায় ?'

'বারাকপুর।' মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল শব্দটা।

সর্দারজী মুখ ফিরিয়ে তাকাল, 'বারাকপুর তো অনেক দূর। আমার যেতেও আপত্তি নেই। কিন্তু দিদি, অনেক ভাড়া পড়বে যে।'

লোকটিকে পছন্দ হল তিস্তার। ভাড়ার কথা তার এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। ট্যাক্সিটা খালি হতেই মন মুক্তি চাইল ওই পরিবেশ থেকে। হ্যাঁ, অন্তত সত্তর আশি পড়বে। আর টাকাটা তার ব্যাগে থাকলেও শেষ কটা দিন বিপাকে পড়তে হতে পারে। সে ব্রিজের ওপর থেকে শিয়ালদা স্টেশনবিল্ডিং দেখল। মুখে বলল, 'কি করা যাবে ?'

'আজ ট্রেন কি বন্ধ ?' সর্দারজী সামনের দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ। মারপিট হচ্ছে।'

'তাহলে আপনি পেছনের দরজাদুটো লক করে দিন। আমি সামনের সিটে দুজন প্যাসেঞ্জার তুলে নিচ্ছি। আপনি মিটারে যা উঠবে তার হাফ দেবেন।'

সরস্বতী প্রেসের সামনে থেকেই সর্দারজী তিরিশ টাকা কড়ারে দুজন প্যাসেঞ্জার পেয়ে গেল। ইচ্ছে করলে লোকটা আরও চারজন লোক তুলতে পারত। তিস্তাকে ধরলে দুশো দশ টাকা রোজগার করত বারাকপুর পর্যন্ত সাটল করে, কিন্তু করল না। এটাও সত্যি। মাঝে সাঝে কলকাতার মানুষের আচরণের মধ্যে কোন সংলগ্নতা থাকে না।

লম্বা সিটে কিছুক্ষণ টান টান বসে থাকার পর শরীর এলিয়ে দিল তিস্তা। এখন হঠাৎ নিজেকে খুব ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে। সে চোখ বন্ধ করল। তাকে যে এভাবে যেতে হচ্ছে তা অরিত্র জানে না। জানলেও আলাদা কিছু হত না। বছর খানেক আগে এই রকম হঠাৎ ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়া সন্ধ্যায় সে অরিত্রর অফিসে পৌঁছেছিল। রিসেপশনে খবর দিয়েছিল অরিত্র যদি একবার বেরিয়ে এসে কথা বলে। আকাশবাণীর রিসেপশন এমন কিছু আরামদায়ক জায়গা নয়। অরিত্র খবর পাঠিয়েছিল তিস্তা যেন একটু অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করেছিল তিস্তা। অরিত্র বেরিয়ে এসেছিল ন'টা নাগাদ। এসে সব শুনে বলেছিল, 'আশ্চর্য ! ট্রেন বন্ধ হয়ে গেছে তো বাসের জন্যে চেষ্টা করোনি কেন ?'

শুনে মনে হয়েছিল তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসে। কিন্তু অরিত্র বলেছিল, 'একটু দাঁড়াও। স্টেশনে খবর নিয়ে দেখি কি অবস্থা।' ফিরে এসে বলেছিল, 'চল, ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি। ট্রেন নর্মাল হয়ে গেছে।'

'তুমি যাবে না ?'

নাঃ। এগারটার আগে ছাড়া পাব না। চল।'

সেই রাত্রে আকাশবাণীর মত নির্জন জায়গা থেকে শেয়ালদা পর্যন্ত সে একা এসেছিল। প্রতিজ্ঞা করেছিল মরে গেলেও আর কখনও সাহায্যের জন্যে

অরিত্রর অফিসে যাবে না। এরকম ঘটনা ঘটলে একসময় খুব তর্ক করত তিস্তা। কিন্তু অরিত্রর যুক্তি যন্ত্রের সত্যি। ও যখন বলে আমার ডিউটি এগারটা পর্যন্ত এবং হুট করে কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার উপায় নেই তখন সেটাই পৃথিবীর শেষ সত্যি হয়ে যায়। অরিত্র সেন, তিস্তার স্বামী, স্ত্রী বিপদে পড়েছে জেনেও যে কর্তব্যে অটল থাকতে পারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লাভ কি। ওর যুক্তি আরও, কেন ? ট্রেনসার্ভিস নর্মাল হয়েছে জেনে তোমাকে ট্যাক্সি তে তুলে দিয়েছিলাম না ?

পৃথিবীর কিছু কিছু স্বামীর স্বপ্ন এককালে দেখত তিস্তা। যে স্বামীদের দায়িত্ববান বা কর্তব্যপরায়ণই শুধু বলা হয় না, মানুষও বলা হয়। যাকে সব বোঝাতে হয় না, বুঝে নিতে পারে। গল্প উপন্যাসে এমন চরিত্রের দেখা এককালে খুব পাওয়া যেত। এক আধজন যে বাস্তবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেই তাও তো নয়। তিস্তার কপালে তেমন জোটেনি। অনেককিছুই তো সে পায়নি, এও না হয় তার একটা।

শ্যামবাজারের মোড় ছাড়াবার সময় বোঝা গেল ট্রেন বন্ধের ভীড় এদিকে চলে এসেছে। ফলে বাসের অবস্থা খুব খারাপ। ভাগ্যিস ট্যাক্সিটাকে পেয়ে গিয়েছিল। সে তো তবু কিছু পেল, অনেকেই, তার মত অবস্থার অনেকেই এখন পথে দাঁড়িয়ে আছে কিছু পাওয়ার আশায়। হ্যাঁ, ট্যাক্সির এই সিটটায় আরও তিনজন স্বচ্ছন্দে বসতে পারত। কিন্তু কোন তিনজন ? ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে তাদের নির্বাচন করার কোন অধিকার তার নেই। দরজা খুললেই জলস্রোতের মত যারা ঢুকবে তাদের শরীরে শক্তি বেশী। তিস্তা চোখ বন্ধ করল।

কিন্তু কেউ সারারাত রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে না। হালিশহর কিংবা কাঁচরাপাড়া অথবা রাণাঘাটের যাত্রীরা শেষ চেষ্টায় বিফল হলে কলকাতার পরিচিতদের বাড়িতে ঢুকে যাবে। বারাকপুর শ্যামনগরের মানুষজন এতে ওতে করে ঠিক পৌঁছে যাবে। এটা মানুষের স্বভাবের একটা ধরণ। নিয়মমাফিক জীবনে যদি হঠাৎ ছেদ পড়ে তাহলে সে দ্বিতীয় রাস্তা খুঁজে নেয় সেটাকে চালু রাখতে। দ্বিতীয় যদি কার্যকর না হয় তাহলে তৃতীয়। ট্রেন বন্ধ হলে বাস, বাস না পেলে ট্যাক্সি টেম্পো, অটো নিদেন পক্ষে মালবাহী লরিতেও জায়গা করে নেওয়া— এই তো জীবন। এই যেমন সে, তিস্তা সেন। পঁয়ত্রিশ বছরের এখনও সুন্দরী মহিলা, যে বঙ্কিম থেকে বাণী বসু পড়ে মনে রেখেছে, পথের পাঁচালি থেকে আগন্তুকের বিবর্তন লক্ষ্য রেখেছে, স্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিক, অস্বাভাবিক থেকে আরও অস্বাভাবিকের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে জেনেছে তোমাকে যা করার একা করতে হবে, কারও ওপর নির্ভর করা তোমার কপালে লেখা নেই। কোমরের কাছে একটু যন্ত্রণা হল। নড়ে বসল তিস্তা। সকালের দিকেও একবার হয়েছে। বারাকপুরের ডাক্তার মল্লিক তাকে দেখছেন। মানুষটি ভাল। কাল সকালে একবার যেতে হবে। এই যাওয়াগুলোও তো যেতে হয় একা।

শেষ বা শেষের আগের ট্রেন ধরে বাড়ি ফেরে অরিত্র। স্টেশনে ওর চেনা এক রিক্সাওয়ালা অপেক্ষা করে। লোকটা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়। জল

ঝড়ের রাতেও সে আসে। এর একটাই মানে অরিত্র লোকটাকে কোনভাবে অধিকার করে রেখেছে। একটা মানুষ বাড়িতে স্ত্রীর কাছে আকর্ষণহীন হলেও বাইরের জগতে অন্য ভূমিকা নিতে পারে। অরিত্র তাদের একজন। ওর সহকর্মী বা পরিচিতদের মুখে তিস্তা কোনদিন নিন্দা শোনেনি। রাত বারোটার পর স্বামীর জন্যে জেগে থাকতে যেসব মহিলা বাধ্য হন তিস্তা তাঁদের শ্রেণীতে পড়ে না। খাবার হটবক্সে রাখা থাকে। অরিত্রর কাছে দরজার চাবি দেওয়া আছে। কখন সে বাড়িতে ঢোকে, স্নান করে খাবার খায় তিস্তা জানে না।

সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর তিস্তার প্রধান কর্তব্য হল অরিত্রর ঘুম না ভাঙ্গানো। জানলা খোলা হয় না। বাজার রান্না ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক কাজ শেষ করে অফিসের জন্যে তৈরী হয়ে ঠিকে ঝিকে চা বানাতে বলে। নিজের খাওয়া শেষ করে বেরুবার সময় কোনকোন দিন অরিত্রকে বিছানা ছাড়তে দেখা যায়। তিস্তা জানে এর পরে দুকাপ চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়বে অরিত্র। ঠিকে ঝি বিরক্ত হবে। সেই বিরক্তি সন্ধেবেলায় তিস্তাকে শুনতে হবে। বিছানা থেকে পৃথিবীর সব খবর ঠোঁঠস্থ হয়ে যাওয়ার পর নামতে নামতে দুপুর। এর মধ্যে ব্রেকফাস্ট দিয়ে বিদায় নিয়েছে ঠিকে ঝি। স্নান খাওয়া শেষ করে বাবু অরিত্র সেন রাজকার্যে যাবেন একটা নাগাদ। বাড়িটা পড়ে থাকবে তালাবন্দী হয়ে।

স্বামীস্ত্রীর মিলিত জীবন যদি দাম্পত্যজীবন আখ্যা পায় তাহলে এটা কি ধরনের দাম্পত্যজীবন ! অথচ আপাত চোখে অরিত্রর কোন ত্রুটি নেই। অরিত্র অন্য কোন মহিলার প্রতি আসক্ত নয়, মদ্যপান করে না। অরিত্র ডিভোর্সী। ডিভোর্সী তো তিস্তাও। তিস্তা তাকাল। সিঁথির মোড় পেরিয়ে যাচ্ছে ট্যাক্সিটা। গাড়ির সামনের আসনের তিনজন মানুষ নিঃশব্দে রয়েছে।

ডিভোর্স মানে তোমার সঙ্গে আমার বনছে না, কোনভাবেই মিল হওয়া সম্ভব নয় তাই দুজনের দুটো আলাদা পথ বেছে নেওয়া উচিত, অতএব সম্পর্কটাকে বাতিল করা যাক। এক কথায় হয়, অনেক রগড়ানোর পর আইনের সম্মতি পেতে বেশ কিছু মাস খরচ করতে হয়। অরিত্রর ক্ষেত্রে ওর প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ এইভাবে হতে পারে কিন্তু তিস্তার বেলায় নয়। ডিভোর্স ওর কাছে অনেক যন্ত্রণাদায়ক মুক্তির নাম। হাত বাড়িয়ে চাইলেই কেউ সেটা তুলে দেয়নি। ডিভোর্স ওর জীবনে মারপ্যাঁচের নিষ্ঠুরতা দিয়ে আড়াল করে রাখা এক তিক্ত অভিজ্ঞতা। আর এর জন্যে কেউ দায়ী নয়।

চোখের পাতায় এখন নিজেকে দেখতে পায় তিস্তা। সেই সতের বছরের তিস্তা। লোকে বলত মোমের পুতুল। বাবা চাকরি করতেন কানপুরে। সেখানেই জন্ম, মিশনারি স্কুলে পড়াশুনা। জীবনের সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলতে শেখা। কলকাতার অনেক বাঙালি মেয়ে যে সত্যিগুলো উচ্চারণ করতে সঙ্কোচ বোধ করত তিস্তা তা মুখের ওপর বলে দিতে পারত। কানপুরের জীবন তার মধ্যে অনেক অনর্থক মেয়েলিপনা আনেনি। স্কুলের শেষ পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে বাবা ভ্রু কুঁচকেছিলেন। গড়ে আর এক নম্বর পেলে আশি হত। তিস্তা বলেছিল, 'আই অ্যাম সরি বাবা। পরীক্ষা দিয়ে ভেবেছিলাম আমি পেয়ে যাব ঠিক।' বাবা বলেছিলেন, 'তাহলে বুঝতে পারছ

যা তুমি ভাব তাই সবসময় ঘটে না। এখন থেকে এই সত্যিটা অনেকবার আবিষ্কার করবে।'

সেদিন বাবা কথা বলেছিলেন দার্শনিকের মত। তাই মনে হয়েছিল। মা বলেছিল, 'মেয়েটা এত ভাল রেজাল্ট করল অথচ তুমি তাকে উপদেশ দিচ্ছ।'

বাবা বলেছিলেন, 'সব ভালই শেষ ভাল নয়।'

কথাগুলো যে কতখানি সত্যি তা বুঝতে বুঝতে পঁয়ত্রিশ বছরে পৌঁছে গেল সে।

ট্যাক্সিটা ডানলপ পেরিয়ে গেল। ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া আর আওয়াজ নেই। গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে ছিটকে আসা আলোয় সামনের লোকগুলোকে অদ্ভুত লাগছে। এইভাবে চললে আটটার মধ্যে বাড়িতে পৌঁছে যাবে সে। কোমরের ব্যথাটা বাড়ছে। পেটের দিকে নেমে আসছে। এমন কিছু নয়। এসময় এরকম হয়েই থাকে। কাল সকালে ডাক্তার মল্লিকের কাছে যেতেই হবে।

আঠারো উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত কখনও জ্বর হয়েছে কি না মনে পড়ে না। আজ পর্যন্ত তার কখনও পক্স হয়নি। চেনাজানা সব মানুষের একবার না একবার অসুখটা হয়ে গেছে। অরিত্র অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সেকি ? তোমার পক্স হয়নি ?' যেন না হওয়াটা অস্বাভাবিক, অপরাধ।

বাবা ভর্তি করে দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্সিতে। ইংরেজিতে অনার্স। বাবার খুব শখ ছিল মেয়ে ইংরেজিতে এম.এ করে কলেজে পড়াবে। সাহিত্যের ওপর রিসার্চ করে নামের আগে ডক্টরেট ছাপ ফেলবে। ইংরেজি সাহিত্যটা খুব ভাল লাগত তিস্তার। বাবার ইচ্ছেটা ওর নিজের ইচ্ছে হয়ে গিয়েছিল।

কলকাতায় আত্মীয়স্বজন বেশ কিছু ছিলেন। বাবার ইচ্ছে ছিল না তাঁদের কারো কাছে তাকে রাখার। বিবেকানন্দ রোডের একটি মেয়েদের হোস্টেলে জায়গা পেয়ে গিয়েছিল সে। বাবা বলেছিলেন, 'এখানে তোমার একটু কষ্ট হবে। বাড়ির কমফর্ট তুমি পাবে না। সেটাও ঠিক নয়। সারাজীবন মানুষের একভাবে যায় না। কষ্ট কি তা প্রত্যেকের জানা দরকার।'

খারাপ লেগেছিল কিন্তু কষ্ট হয়নি। একঘরে তিনটে মেয়ে যাদের ভাবনা চিন্তা কলেজে পড়লেও প্রাগৈতিহাসিক। সুজাতা নামের একটা মেয়ে গল্প করছিল যে সে তিনবছর বয়স থেকেই টেপজামার ওপর হাঁটুঢাকা ফ্রক পড়েছে। যতই গরম লাগুক এর অন্যথা হয়নি। তিস্তা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন ?'

'বাঃ, তুমি জানো না ?'

'না।' বোকার মত মাথা নেড়েছিল তিস্তা।

'মা বলত মেয়েমানুষের শরীর সবসময় ঢেকে রাখা উচিত।'

হেসে ফেলেছিল তিস্তা, 'তিনবছর বয়সে তোমার মেয়েমানুষের শরীর হয়ে গিয়েছিল নাকি ?'

'আমি জানি না।' সুজাতা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, 'মা যা বলত তাই করেছি।'

এদের তিস্তা একটু একটু করে বুঝেছে। এই সংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েদের জন্যে তার শুধুই মায়া হত। বেশী বোঝালে এরা হাঁ করে চেয়ে থাকত কিন্তু মেনে

নিত না। কিন্তু আর এক ধরনের মেয়ের দেখা পেল সে প্রেসিডেন্সিতেই। যদিও তাদের সংখ্যা খুব অল্প কিন্তু কথাবার্তায় চালচলনে তারা নিজেদের আলাদা করে ফেলেছিল। অন্য মেয়েরা যেমন তাদের ঈর্ষার চোখে দেখত ছেলেরাও এদের কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল সহজেই। এদের বক্তব্য ছিল স্ত্রী স্বাধীনতার সপক্ষে। মেয়েরা কোন অবস্থাতেই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ নয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে মেয়েদের দাবিয়ে রেখেছে পুরুষরাই। একজন পুরুষ যদি চারটে বিয়ে করতে পারে তাহলে একটা মেয়ে তা পারবে না কেন ? অর্জুনকে ভালবেসে দ্রৌপদী শ্বশুরবাড়িতে এসে শুনল শাশুড়ি তাকে না দেখেই সব ভাইকে গ্রহণ করতে বলছে। সে করতে বাধ্য হয়েছিল পাঁচ পাণ্ডবের চাপেই। বিয়ের পর মেয়েদের শাঁখা সিঁদুর পরতে হয়, ছেলেদের কেন বিবাহের চিহ্ন শরীরে রাখতে হয় না। এসব কথা শুনলে অকাট্য মনে হয়। আর যারা তা বলে তারা আকর্ষণীয়া হয়ে ওঠে। জয়ন্তী নামের একটি মেয়ের সঙ্গে তিস্তার বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে ওই দলের। প্রথমদিন কফিহাউসে গিয়েছিল তিস্তা জয়ন্তীর সঙ্গে। ওর বান্ধবীরা ছাড়াও তিনটে ছেলে ছিল এক টেবিলে। চুপচাপ ওদের কথা শুনে যাচ্ছিল তিস্তা। মনে হল ছেলেরাও একমত। এতকাল মেয়েদের ওপর অনেক অত্যাচার হয়েছে এবার তার সংশোধনের সময় এসেছে।

ধরিত্রী নামের একটা মেয়ে ঘোষণা করে ফেলল, 'রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর ছাড়া কোন বাঙালি পুরুষ মেয়েদের জন্যে ভাবেনি।'

হঠাৎ মজা করতে ইচ্ছে করল তিস্তার, 'পুরুষদের জন্যে কে ভেবেছিল ?'

ধরিত্রী বলেছিল, 'ওরাই তো সব। ওদের জন্যে ভাবার কি দরকার ?'

তিস্তা বলল, 'মেয়েরাও তো সব হতে পারত।'

'পারেনি। পুরুষরা হতে দেয়নি।'

'রবীন্দ্রনাথ ?'

'অসম্ভব। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মেয়েদের অপকার করেছেন।'

'যেমন ?'

'ওঁর এক দাদা পাগল ছিল। তিনি মরে যাওয়ার পর বউদি বাপের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। অল্পবয়স্ক বলে তাঁর বাবা আবার বিয়ের চেষ্টা করেন। খবর শুনে দেবেন্দ্রনাথ ছেলেদের হুকুম দিয়েছিলেন তাঁকে ফিরিয়ে আনতে। সব ছেলেই কোন না কোন বাহানায় সরে পড়েছিল শুধু রবীন্দ্রনাথ পিতৃআদেশ পালন করতে গিয়েছিলেন। একটি মেয়েকে আবার স্বাভাবিক জীবনে যাওয়া থেকে নিরস্তকরে বিধবার জীবনে বন্দী করতে চেয়েছিলেন।'

'কিন্তু ওঁর পুত্রবধূ বিধবা ছিলেন বলে শুনেছি।'

'নিজের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত অন্যের ওপর চালানো আর কি !'

তিস্তা হেসেছিল, 'তাহলে রামমোহন আর বিদ্যাসাগর ব্যতিক্রম ?'

ধরিত্রী বলেছিল, 'হ্যাঁ। একজন সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেছিলেন অন্যজন বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং বিধবাবিবাহ চালু করেছিলেন নইলে এতদিনে আমরা কোথায় তলিয়ে যেতাম ভাবতে পারছ না।'

'কেন করেছিলেন ?' ছোট্ট প্রশ্ন করেছিল তিস্তা।

'কেন ? আমাদের উপকার করতে।'

'উঁহু। তুমি একটু ভুল করছ।'

'তার মানে ?'

'তুমি এতক্ষণ যে ফর্মুলায় কথা বলছিলে সেই ফর্মুলায় ব্যাপারটা যদি ফেল তাহলে ওই কাজগুলোর পেছনে যুক্তি খুঁজে পাবে।'

ওরা সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করছিল। জয়তী বলল, 'তুই বল না।'

'এমন হতে পারে রামমোহনের মনে হয়েছিল সতীদাহের ফলে অনেক সুন্দরী সুন্দরী যুবতী বিধবাকে পুড়ে মরতে হচ্ছে। তাদের যদি বাঁচিয়ে রাখা যায় তাহলে পুরুষরা আনন্দিত হবার সুযোগ বেশী করে পাবে।' তিস্তা বলেছিল।

জয়তী বলল 'যাঃ।'

তিস্তা বলল, 'তোরা এতক্ষণ যেভাবে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করছিলি তার সঙ্গে এই কথাগুলো চমৎকার মিলে যায়।'

ছেলেরা খুব হেসে উঠেছিল। জয়তী গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আর বিদ্যাসাগর ?'

তিস্তা বলল, 'আমার বলতে খুব খারাপ লাগছে কিন্তু এভাবে তো ব্যাখ্যা করাই যেতে পারে অল্পবয়সী মেয়েগুলো বুড়ো স্বামী মরে গেলে বিধবা হয়ে অন্দরমহলে পড়ে থাকত। তাদের মধ্যে যথেষ্ট সুন্দরীও ছিল। সেই মেয়েদের ব্যবহার করার জন্যে ধরো বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ধরিত্রী রাগতস্বরে বলল, 'তুমি ইচ্ছে করে ভুল ব্যাখ্যা করে আমাদের বক্তব্যকে ছোট করতে চাইছ !'

'আমি কিছুই করতে চাইছি না। যে যার নিজের কাজটা ঠিকমত করলে এসব কমপ্লেক্সে ভুগতে হয় না।' তিস্তা বলেছিল।

'তুমি বাইরে মানুষ হয়েছ তো তাই জানো না এদেশের মেয়েদের অবস্থাটা।' ধরিত্রী উঠে গিয়েছিল।

কিন্তু খবরটা চাউর হতে বেশী সময় নেয়নি। বিদ্যাসাগর এবং রামমোহনকে নিয়ে কানপুরের একটা মেয়ে রসিকতা করেছে যাতে ধরিত্রীরা জব্দ হয়। কেউ কেউ তিস্তাকে দেখেও গেল। কফিহাউসের টেবিলে তখন তিস্তার জমাট আড্ডা। কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে ছেলেরাও এসেছে। এদের একজন সুমিত। ছেলেটা কম কথা বলে, চারমিনার সিগারেট খায়। পড়ে সিটি কলেজে। কিন্তু তিস্তা বুঝতে পারে সুমিত সারাক্ষণ তাকে লক্ষ্য করে যায়। ওর ঠোঁটে অদ্ভুত কিছু আছে। সেটা নিষ্ঠুরতা না উদাসীনতা তা বুঝতে পারে না তিস্তা। সুমিতকে এড়িয়ে যায় সে প্রায় প্রতিদিন। বিকেল বেলায় বাড়িতে ফেরার সময় বাস ট্রামে না উঠে ওইটুকু পথ হেঁটে আসতে মন্দ লাগে না। সুমিত প্রথম দুটো দিন পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, 'চল, পৌঁছে দিয়ে আসি।'

এমন অপ্রত্যাশিত অনুরোধে বিপাকে পড়েছিল তিস্তা। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল, 'আমার কোন সাহায্যের দরকার নেই। ধন্যবাদ।'

তবু তিস্তা বেশ কিছুদিন লক্ষ্য করেছে সুমিতকে পেছন পেছন আসতে। প্রচণ্ড অস্বস্তি হত সেইসময়। ইচ্ছে করত ডেকে জিজ্ঞাসা করে। একদিন করেওছিল। অম্লান মুখে সুমিত জবাব দিয়েছিল, 'পেছন থেকে দেখলেও কাউকে ভাল লাগে তা তোমাকে দেখার আগে বুঝিনি।'

খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। বলেছিল, 'এটা আমি ঘেন্না করি।'

'সরি। কিন্তু পাশে হাঁটতে দিচ্ছ না যে!'

'আমি চাই না তুমি এমন করো।'

হ্যাঁ, তারপর থেকে সেটা বন্ধ করেছিল সুমিত। কিন্তু কফিহাউসের গেটে রোজ দাঁড়িয়ে থাকত। প্রেসিডেন্সি থেকে বেরিয়ে এইদিকে আসামাত্র হাসত। সারাক্ষণ একই টেবিলে বসে সিগারেট খেয়ে যেত চুপচাপ। একদিন কথা হচ্ছিল টিউশনি নিয়ে। ক্লাশের অনেকেই টিউশনি করে। কেবল অভাবের জন্যে নয় অনেকে শখেই করে যাতে বাড়ির ওপর চাপ না থাকে।

তিস্তা বলল, 'আমাকে কে টিউশনি দেবে?'

কেউ কিছু বলার আগেই সুমিত বলল, 'তুমি টিউশনি করতে চাও?'

তিস্তা কথা না বলে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'আমার মায়ের সঙ্গে দেখা কর। ভাই-এর জন্যে টিউটার খুঁজছে।' সুমিত গম্ভীর গলায় জানাল। জয়তী তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করল, 'কি ব্যাপার সুমিত? ওভাবে বলছ কেন? তুমিই তো ওকে নিয়ে আলাপ করিয়ে দিতে পার। তোমার মা ওকে চিনবেন কি করে?'

'আমার সঙ্গে হাঁটতে তিস্তা পছন্দ করে না।' সুমিত বলল।

জয়তী কিছু বলার আগেই তিস্তা বলল, 'শোন, আমি কখনও কাউকে পড়াইনি। কিন্তু চ্যালেঞ্জ নিতে পড়াতে রাজী আছি। তোমার সঙ্গে হাঁটতে রাজী হইনি কারণ প্রয়োজন ছিল না। এখন প্রয়োজনে আপত্তি নেই।'

'তার মানে প্রয়োজনে তুমি সব কিছু করতে পার?'

'না। তবে যেটুকু করলে নিজের খারাপ লাগবে না বা লাগলেও মানিয়ে নিতে পারব ততটুকু।' তিস্তা জবাব দিয়েছিল।

সেই বিকেলেই সে সুমিতের সঙ্গে ওদের বাড়িতে গিয়েছিল। উত্তর কলকাতার বনেদী বাড়ি। বাইরের ঘরে চটি ছেড়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। সেই ঘরে আইনের বই প্রচুর। ওগুলো কার জানতে চাইলে সুমিত জবাব দিয়েছিল, 'পিতৃদেবের।'

সুমিতের মা মোটাসোটা পান খাওয়া গিন্নী টাইপের মানুষ। সুমিত যখন পরিচয় করিয়ে নিয়ে আসার কারণ জানাল তখন ভদ্রমহিলা উচ্ছ্বসিত হলেন, 'বাঃ এতদিনে ছেলে সংসারের একটা উপকার করল। আমার ছোট ছেলে ক্লাশ সিক্সে পড়ে। আমার তো ইচ্ছে রোজ তুমি ওকে এসে পড়াও।'

সুমিত বলল, 'আজকাল কেউ সপ্তাহে তিনদিনের বেশী পড়ায় না।'

'তুই থাম। আমি আর আমার মেয়ে বুঝে নেব। কি নাম যেন?'

'তিস্তা।'

'বাব্বা। নদীর নামে নাম? আমি ওসব বলে ডাকতে পারব না। আমি তোমাকে মেয়ে বলে ডাকব। কোথায় থাক?'

'হোস্টেলে।' তিস্তার বেশ ভাল লাগছিল মহিলার কথা।

'ওমা! তাই এমন কাঠ কাঠ চেহারা। খেতে দেয় না বোধহয়। বাড়ি কোথায়?'

'বাবামা থাকেন কানপুরে।'

'সে তো অনেকদূর। যাকগে, আলাপ যখন হল তখন আমাকেই মা ভাববে। তা হ্যাঁগা, কত দিতে হবে তোমাকে?'

'দেখুন, আমি তো কখনও টিউইশানি করিনি। তাই—।'

'ঠিক আছে। কদিন পড়াও, তারপর ভাল বুঝে মা যা দেবে মেয়ে কি নেবে না? গৌরী ও গৌরী।' শেষের তিনটে শব্দে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন।

একটি কাজের মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। সুমিতের মা তাকে বললেন, 'একটা প্লেটে মোহনভোগ আর দুটো রসগোল্লা নিয়ে আয়।'

তিস্তা আঁতকে উঠল, 'না না। আমি মিষ্টি খাই না।'

'ওই এক ঢঙ হয়েছে আজকালকার মেয়েদের, মিষ্টি না খেলে শরীর বাড়বে কি করে? ভরন্ত শরীর না হলে পরে যুঝতে পারবে না। খ্যাংড়া কাঠির মত মেয়েছেলেকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না মেয়ে। নাও, খাও।'

তিস্তা দেখল তার সামনে একটা কাঁসার থালায় সুজি এবং রসগোল্লা দিয়ে গেল কাজের মেয়েটি। মহিলা বললেন, 'রোজ বিকেলে এ বাড়িতে আর কিছু হোক বা না হোক মোহনভোগ হবেই। তোমার মেশোমশাই কোর্ট থেকে ফিরে এক থালা খাবেন। নাও খেয়ে নাও।'

কাঁসার থালায় চামচ ছিল না। খেতে হলে আঙুল ব্যবহার করতে হয়। ভদ্রমহিলার এদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। দ্বিধা কাটিয়ে সুজি মুখে তুলল তিস্তা। মিষ্টিতে মুখ ভরে গেল। তবু মনে হল এই কলকাতা শহরে এমন একটা বাড়ি নেই যেখানে সে একটু স্নেহের স্পর্শ পায়। একটা তো হল।

সুমিতের ভাই খুব বুদ্ধিমান নয়। পড়াশুনোতেও মন নেই। প্রথম দিন পড়াতে বসেই সেটা টের পেল তিস্তা। ছেলেটার নাম অমিত। অমিত বলল, 'দিদি, আমার পড়তে একটুও ইচ্ছে করে না। তুমি মাকে বলো না।'

সেই ছেলের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল একসময়। সপ্তাহে চারদিন পড়াতে যায় তিস্তা। যাওয়ার সময় সুমিত সঙ্গে থাকে। মাসীমার সামনে বসে মোহনভোগ খেতে হয়। পড়ানো শেষ হলে সুমিত তাকে হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে যায়। এই যাওয়া আসার পথে সুমিত নানান কথা বলে। বিশেষ করে আধুনিক ইংরেজি উপন্যাসের কথা। কত নতুন লেখক, কত নতুন উপন্যাস গল্প কবিতা যাদের নাম সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় এখনও ওঠেনি। তিস্তার চোখের সামনে সুমিতের চেহারা বদলে গেল। এমন একটা গভীর মনের ছেলের সঙ্গে সে আর অসহজ ব্যবহার করতে পারল না। উল্টে সে হঠাৎই দারুণ রকম আকৃষ্ট হল। যদি এর নাম ভালবাসা হয় তাহলে তাই

জীবনটা তখন অদ্ভুত ছন্দে বাঁধা। সকালে কলেজে যায় তিস্তা। সেখান থেকে লাইব্রেরি হয়ে কফিহাউস। কফিহাউস থেকে সুমিতের সঙ্গে গল্প করতে করতে ওদের বাড়ি। মোহনভোগ খাওয়া এবং অমিতকে পড়ানো। পড়ানো শেষ হলে আবার সুমিতের সঙ্গেই হোস্টেলে ফেরা। ওদের বাবার সঙ্গে

কয়েকবার দেখা হয়েছে। যেহেতু ভদ্রলোক কোন কথা বলেননি সেও আগ বাড়িয়ে সামনে যায়নি।

এরকম একদিন সুমিতের সঙ্গে বাড়িতে পৌঁছে সে দেখল ওর মা নেই। তিনি অমিতকে নিয়ে হঠাৎ এক আত্মীয়ের বাড়ি চলে গেছেন। সুমিত ওকে নিজের ঘরে নিয়ে এলে তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি জানতে না উনি থাকবেন না ?'

'জানতাম।'

'বাঃ। তাহলে বলনি কেন ?'

'বললে তুমি এ বাড়িতে আজ আসতে না।'

'ও। তা আনলে কেন ?'

'তোমাকে খুব চুমু খেতে ইচ্ছে করছে।'

'ডোন্ট বি ফানি।'

'সিরিয়াসলি বলছি।'

'হঠাৎ তোমার এমন ইচ্ছে হল কেন ?'

'হঠাৎ নয়। সেই প্রথমদিকে তোমাকে ফলো করে যখন হাঁটতাম তখন থেকে। তুমি জানো না তোমার হিপ কি সুন্দর।'

'সুমিত।'

'ওহো, সরি। ও কে' সুমিত সামনে এসে ওর কাঁধে হাত রাখল, 'লেট মি ডু দ্য কারেক্ট ডিউটি অফ মাইন।'

তিস্তা চট করে সরে দাঁড়াল, 'সরি সুমিত।'

'ফর গডস সেক, হোয়াই ?'

'বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইট।'

'ডোন্ট ইউ লাভ মি ?'

'ইয়েস আই ডু।'

'দেন, হোয়াট হার্ম ইন কিসিং !'

'তুমি এটা করবে বলে পরিকল্পনা করেছ। তোমার এই অ্যাটিচুডকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এটাই সত্যি।'

'মাই গড। ইউ আর রিয়েল কনজারভেটিভ। চুমু খেতে কাউকে কোন ডাক্তারের কাছে যেতে হয় না।'

'সুমিত।'

'কাম অন।'

'নো।'

'ওয়েল। কি করলে তুমি রাজী হবে ?'

'আমি জানি না।'

'নো। তোমাকে জানতে হবে। ইউ মাস্ট টেল মি।'

'বেশ। আমরা যখন বিয়ে করব।'

'দাঁড়াও। বিয়ে না করলে তুমি চুমু খাবে না ?'

'নো।'

'তাহলে যখন তখন নয়, এখনই। আমরা এখনই বিয়ে করব।'

'তার মানে ?'

'আমরা রেজেষ্ট্রি করব।'

অবাক হয়ে গিয়েছিল তিস্তা। সুমিতকে তার ভাল লাগত। ভালও বাসতে শুরু করেছিল। কিন্তু একটা চুমু খাওয়ার জন্যে যে সুমিত তাকে বিয়ে করতে চাইবে অমন উন্মাদের মত তা সে কল্পনা করেনি। তিস্তার খুব ভাল লাগল। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল তখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে সুমিতকে চুমু খায়। কোনমতে সামলালো সে। সুমিত ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সে বলল, 'বিয়ে করলে দায়িত্ব নিতে হয়, মনে আছে ?'

'কি ভাবছ ? আমরা খুব গরীব ?'

আর কথা বাড়ায়নি। সেদিন বেরিয়ে আসার পর মনে হয়েছিল এই একটা অহংকার নিয়ে সে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারবে। কি ভুলই না ভেবেছিল।

নোটিশ দেওয়া এবং অন্যান্য নিয়ম মানার কাজগুলো করেছিল সুমিতই। ওয়েলিংটনের মোড়ে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের অফিসে যাওয়ার আগে তিস্তা একটা কাজ করেছিল। সে কানপুরে চিঠি লিখেছিল। সরাসরি বাবাকে। সমস্ত কথা জানিয়ে লিখেছিল সুমিত চাইছে এখনই আমাদের বিয়েটা হয়ে যাক। আমি একটু দ্বিধায় আছি সময় নিয়ে। তোমার মতামত চাইছি।

উত্তরে বাবার চিঠি এসেছিল চটপট। তোমাকে কলকাতায় পড়তে পাঠানো হয়েছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। সেটা পূর্ণ হতে অনেক দেরি আছে। অথচ তুমি তাতে মন না দিয়ে আর পাঁচটা মেয়ের মত বিয়ের কথা ভাবছ দেখে আমি মর্মাহত। তোমার কাজ পড়াশুনা করা। বন্ধুবান্ধব ওই বয়সে হতেই পারে। তাদের সঙ্গে মেলামেশায় আমি কখনই আপত্তি করিনি। ব্যাপারটা ওই পর্যায়ে রাখলেই খুশী হব। এসত্ত্বেও তুমি যদি এখনই বিয়ের দিকে ঝোঁক তাহলে সেটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার মায়েরও একই মত।

চিঠিটা পড়ে খুব খারাপ লেগেছিল তিস্তার। কিন্তু সুমিত বলেছিল, 'এই দেশের বাবামা কখনই চান না ছেলেমেয়ে পছন্দ করে বিয়ে করুক। নিজেদের পছন্দ ওদের ওপর চাপিয়ে দিতে ওদের জুড়ি নেই।'

'আমি এখন কি করব ?' তিস্তা দ্বন্দ্বে দুলছিল।

'যা ঠিক আছে তাই করবে। তুমি তোমার বাবার সঙ্গে চিরকাল থাকবে না। আমি আর তুমিই এখন একত্রে থাকছি।'

মুহূর্তেই মন ঠিক করে নিয়েছিল তিস্তা। যার সঙ্গে সারাজীবন স্বামীস্ত্রীর মত থাকতে হবে তাকে দুঃখিত করার কোন অর্থ হয় না এখন। জয়ন্তী এসেছিল তার হয়ে। সুমিতের বন্ধুরাও এসেছিল। সইসাবুদের পর ওরা আমিনিয়া রেস্টুরেন্টে গিয়ে চিকেন চাপ আর রুটি খেয়েছিল। পেমেন্ট করেছিল ওদের এক বন্ধু, সীতেশ।

সীতেশও একসময় হোস্টেলে থাকত। ওই সময়ে যারা এসেছিল তারা অভিনন্দনের বন্যায় তাদের ভাসিয়ে দিয়েছিল। সিঁথিতে সিঁদূর পরার মুহূর্তে কেঁপে উঠেছিল তিস্তা। কেমন ঝুম হয়ে ছিল সে।

দুপুরে ব্যাপারটা চুকে গিয়েছিল। তিস্তা বলল, 'এই একমাথা সিঁদূর নিয়ে

আমি হোস্টেলে যেতে পারব না।'

জয়ন্তী বলেছিল, 'তুই এখনও হোস্টেলের কথা ভাবছিস? সুমিতের মা তোকে ভালবাসেন, উনি তোকে বরণ করে নেবেন।'

জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে তিস্তা বলেছিল, 'তোরা সঙ্গে চল।'

জীবনে প্রথমবার এমন লজ্জা জড়ানো সংকোচের অস্তিত্ব টের পেল তিস্তা। সুমিত একটু ইতস্তত করে বলেছিল, 'আজ না গেলে হয় না?'

জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন? অসুবিধে কোথায়?'

'না, মানে, আমি মাকে কিছু বলিনি তো। বলে রাখলে ভাল হত। মা তো বলতেই পারে তোরা আমাকে তৈরি হবার সুযোগ দিলি না।' সুমিত বলেছিল।

বন্ধুরা সুমিতের কথায় ভেবে পাচ্ছিল না কি করা উচিত। তিস্তা না বলে পারল না, 'অসম্ভব। আমি এই একমাথা সিঁদুর নিয়ে হোস্টেলে যেতে পারব না।'

'ঠিক আছে, সিঁদুর তুলে যাও।' সুমিত বলেছিল।

'কি বললে? সিঁদুর তুলব?' অবাক হয়ে গিয়েছিল তিস্তা।

'তোমার মত আধুনিক মেয়ে সিঁদুর নিয়ে নিশ্চয়ই ফার্স করবে না!' ঠাট্টা করেছিল সুমিত।

ঠোঁট কামড়েছিল তিস্তা। সিঁদুর সম্পর্কে তার কোন মায়া নেই। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে নিজেকে যে অন্যরকম লাগছে তা ওই সিঁদুরের জন্যে তাও তো অস্বীকার করতে পারছে না।

জয়ন্তী বলেছিল, 'বাজে কথা বলো না সুমিত। তাছাড়া ওর হোস্টেলে ম্যারেড মেয়েদের থাকা নিষেধ আছে। বিয়ে যখন করেছ তখন বাড়িতেই নিয়ে চল।'

পাঁচ বন্ধু একটা ট্যাক্সিতে চেপে সুমিতের বাড়িতে হাজির হয়েছিল। তখনও আকাশে রোদ। ফুচকাওয়ালারা পাড়ার মোড়ে বসেনি। কাজের মেয়ে দরজা খুলে দিতে সুমিত হুকুম করেছিল, 'মাকে ডেকে দাও। জরুরী ব্যাপার।' মেয়েটা অবাক হয়ে চলে গেল।

এটা বাইরের ঘর অথবা সুমিতের পিতৃদেবের আইন ব্যবসায়ের ঘর। কোনদিনই এই ঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি তিস্তাকে। প্রথম দিন যখন এসেছিল তখনও সুমিত তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল। এই পরিবর্তন নতুন আর একটা অস্বস্তির জন্ম দিল। এই সময় অমিত এল স্কুল থেকে। ঘরে ঢুকে দাদার বন্ধুদের দেখে সে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে তিস্তাকে দেখতে পেয়ে হেসে ফেলল, 'তুমি? এখানে কেন? ঘরে চল তিস্তাদি।'

জয়ন্তী হাসল, 'আর দিদিফিদি না, এখন থেকে বউদি বলবে।'

'বউদি?' অমিত অবাক হয়ে তিস্তাকে দেখল। তারপর ছুটে ভেতরে চলে গেল। সুমিত চাপা গলায় মন্তব্য করল, 'লজ্জা পেয়েছে।'

ওরা বসেছিল কাঠের চেয়ারগুলোতে। কাঠখোট্টা ধরনের লম্বা একটা ঘড়িতে সময় বাজল চারটে। ঠিক তখনই সুমিতের মা ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। ওরা সবাই উঠে পড়ল তাঁকে দেখে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি

ব্যাপার সুমিত ?'

জয়ন্তী ফিসফিস করে তিস্তার কানে বলেছিল, 'প্রণাম কর, মা।'

দুটো পায়ে যেন একমন লোহার শেকল, তাই নিয়ে এগিয়ে গিয়ে নিচু হল তিস্তা। খুব অবাক হয়ে ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'একি ! এসব কেন ?'

সুমিত জবাবটা দিল, 'মা, আমরা আজ বিয়ে করেছি।'

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে রইলেন। দলের কেউ কথা বলছিল না। হঠাৎই নিজেকে যেন ফাঁসির আসামী বলে মনে হতে লাগল তিস্তার।

'আমার অনুমতি নিয়েছিলে ?'

'না মা, হঠাৎই—।'

'কোথায় ? কালীঘাটে ?'

'না। আমরা সই করে বিয়ে করেছি।'

'সেটা করতে গেলে অনেক আগে নোটিশ দিতে হয় বলে শুনেছিলাম।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে হঠাৎ হয়নি !'

সুমিত চুপ করে রইল। ভদ্রমহিলা এবার তিস্তার দিকে তাকালেন, 'তুমি যে আমার ছেলেকে বিয়ে করলে একথা তোমার বাপ-মা জানে ?'

ঠোঁট টিপে মাথা নেড়ে না বলেছিল তিস্তা।

'চমৎকার। শোন, তুমি পরের ঘরের মেয়ে। যতক্ষণ না তোমার বাবা নিজে এসে আমাকে অনুরোধ করছেন ততক্ষণ আমি তোমাকে এ বাড়ির বউ হিসেবে গ্রহণ করতে পারব না।' ভদ্রমহিলা ফিরে যাওয়ার উপক্রম করতেই সুমিত বলেছিল, 'মা, ওর বাবা এখনই বিয়ের বিরুদ্ধে ! তুমি তো তিস্তাকে ভালবাস !'

'ওর বাবা বিরুদ্ধে হলে আমি সপক্ষে যাব এমন ভাবনা ভাবছ কি করে ? তাছাড়া ওকে আমি ছেলের মাস্টারনি হিসেবে পছন্দ করতাম ! এখন থেকে আর ও তা থাকছে না। আর কিছু বলার আছে ?'

এবার জয়িতা বলল, 'মাসিমা, আপনি একটু নরম হন।'

'আমি তো নরম আছি। ওকে গ্রহণ করতে একটুও আপত্তি নেই। শুধু ওর বাবাকে আমার কাছে আসতে হবে। এ বাড়িতে থাকলে ওর খাওয়াপরার দায়িত্ব তো আমার। যাকে বিয়ে করল তার তো এক পয়সা মুরোদ নেই। তাই ওর বাপের সঙ্গে কথা বলতে হবে না ?'

এই সময় এক প্রায় বৃদ্ধ মানুষ বাইরের দরজা দিয়ে উঁকি মারলেন, 'কি হচ্ছে ?' সুমিতের মা গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন, 'তোমার কোন দরকার নেই। যাও, ভেতরে যাও।' ভদ্রলোক আর একটিও কথা না বলে জোব্বা-প্রমাণ ব্যাগ নিয়ে সুড়সুড় করে ভেতরে চলে গেলেন। তাঁর যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে সুমিতের মা বললেন, 'এসো তোমরা।'

মিনিট দুয়েক বাদে ওরা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিল। তিস্তা অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলে রাখতে পারছিল। জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করল, 'তুই বলেছিলি তোকে খুব ভালবাসেন !'

'তাই মনে হত। রোজ সুজি আর রসগোল্লা খাওয়াতো !' তিস্তার গলা

অন্যরকম।

সুমিত জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কি করা যায় ?'

জয়ন্তী বলল,'সেটা তুমি ঠিক করো। ধরিত্রী বলে বিয়ের পর মেয়েকে কেন ছেলেদের বাড়িতে যেতে হবে, উল্টোটা হয় না কেন ? ঠিকই বলে। তুমি তো একটু পরে সুড়সুড় করে নিজের বাড়িতে ফিরে যাবে, তিস্তার কি হবে ?'

'আশ্চর্য ! তোমার কিসে মনে হল ওর একটা ব্যবস্থা না করে আমি বাড়ি ফিরে যাব ?'

'বেশ। তাহলে একটা ব্যবস্থা করো।'

'সেটাই তো মাথায় আসছে না। আচ্ছা, ম্যারেড মেয়েদের হোস্টেল নেই ?'

'আছে। কিন্তু যাওয়ামাত্র আজ থেকে সিট পাওয়া যাবে নাকি ?'

বলরাম নামের একটি চুপচাপ ছেলে ওদের দলে ছিল। এতক্ষণে সে কথা বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না তোরা বিয়ে করেছিস কি জন্যে ?'

'একসঙ্গে থাকব বলে।'

'কোথায় থাকছিস ? হোস্টেল খুঁজছিস কেন ?'

'কিভাবে থাকব ? মায়ের কথা তো শুনলি।'

'অদ্ভুত। কলকাতায় ঘরভাড়া নে, দুজনে থাক।'

'ঘর ভাড়া চাইলেই পাওয়া যায় ?'

'তোদের চাই ? আমার এক পিসেমশাই হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে থাকেন। ওঁর বাড়িতে তিনটে ভাড়াটে। একটা গতকাল উঠে গেছে। আমি বললে তোকে দিতে পারে।'

'জায়গাটা কোথায় ?'

'দমদমে। কাশীপুর ক্লাবের পেছনে।'

'ভাড়া ?'

'আগের লোকটা শ'খানেক দিত। একমাসের অ্যাডভান্স।'

সুমিত কিছু বলার আগেই জয়ন্তী বলে উঠল, 'এর চেয়ে ভাল আর কিছুতেই হয় না। দুশো টাকা লাগছে এখন। টিউশুনি করে আর তোর বাবার পাঠানো টাকায় একটু কষ্ট করে চালিয়ে নে। সুমিতও রোজগারের চেষ্টা করুক। কারো ওপর নির্ভর করতে হবে না। আর দেরি না করে এখনই হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে যাওয়া যাক।'

স্বপ্নের মত ঘটে গেল ঘটনাগুলো। তখন সবে বাবার পাঠানো টাকা তিস্তার হাতে এসেছে। কলেজের মাইনেটাই দিয়েছিল শুধু, হোস্টেল এবং আনুষঙ্গিক খরচ তখনও না মেটানোয় ব্যাগে টাকা ছিল। সুমিত কিছু জোগাড় করল।

হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনের বাড়িটায় যে ঘরটি খালি সেটা দোতলায়। লাভের মধ্যে ওর লাগোয়া বাথরুম আছে। সব শুনে বলরামের পিসেমশাই বললেন, 'দ্যাখো, আমি ঝামেলা পছন্দ করি না। ভাড়া দিচ্ছ, থাকবে। কিন্তু পুলিশ এলে চলে যেতে হবে।'

ভদ্রলোককে বিয়ের সার্টিফিকেট দেখাতে হল অবশ্য।

ঘরে কোন আসবাব নেই। খাট দূরের কথা একটা র‍্যাক পর্যন্ত নেই। এই

ঘরে বাস করতে গেলে অনেক কিছুর প্রয়োজন। ওদের দুজনের কাছে যা আছে তা দিয়ে এতসব কেনা সম্ভব নয়। ওরা বিবেকানন্দ রোডে ফিরে এল।

হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডে সমস্ত শুনে হতভম্ব। বললেন, 'এরপরে তোমার এখানে থাকা চলবে না। তোমার বাবাকে আমি আজই জানিয়ে দিচ্ছি।'

'আমি জানি এখানে থাকা চলবে না। আমি আমার জিনিসপত্র নিতে এসেছি।' তিস্তা স্বাভাবিক গলায় বলেছিল।

জিনিসপত্র দিতে ভদ্রমহিলার কুণ্ঠা ছিল কিন্তু আটকে রাখার অধিকার না থাকায় কিছুই করতে পারলো না। যা কিছু দেয় ছিল দেবার পর তিস্তার আগে ব্যাগে চল্লিশ টাকা পড়ে রইল। বিছানাপত্র স্যুটকেশ নিয়ে হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে যাওয়া ট্যাক্সি ছাড়া যাওয়া— সম্ভব নয়। কিছু টাকা কমে গেল। বন্ধুরা চলে গিয়েছিল বিবেকানন্দ রোড থেকে। অনেক অভিনন্দন নিয়ে ওরা যখন ট্যাক্সিতে উঠেছিল তখন সন্ধে। এই যে এতক্ষণ একটার পর একটা টেনসনের ঢেউ ওরা পেরিয়ে এল, এবার তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে শরীরে, মনে। তিস্তা অবাক হয়ে দেখল সুমিত খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। যেন কিছুই হয়নি। সে মনে মনে খুশি হয়েছিল। একজন শক্ত না হলে চলবে কেন!

মাটিতেই বিছানা করা হল। চিড়িয়ামোড় থেকে রুটি আর মাংস কিনে আনল সুমিত। তিস্তার নিজের দুটো বালিশের ওয়াড় একটু ময়লাটে হয়ে এসেছিল, এখানে এসে সেটা খুলে নতুন পরিয়েছে। একজনের দুটো বালিশ দুজনের কাজে লাগবে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে সুমিত বলল, 'একটা ভুল হয়ে গেছে।'

'কি?'

'মাকে জানানো হয়নি।'

রাগ হয়ে গেল তিস্তার, 'কি জানাবে?'

'না, মানে, এখানে আছি। বাড়ি ফিরব না।'

'আশ্চর্য! তোমার মা তো বলেই দিয়েছেন।'

'স্পষ্ট কথা হয়নি কিছু।'

'আর কি স্পষ্ট হবে?'

'তোমার কথা বলেছেন। হয়তো ভেবেছেন আমি ফিরে যাব।

'তুমি কি বলতে চাইছ?'

'আমার একবার বলে আসা উচিৎ যে এখন থেকে এখানেই থাকছি।'

হঠাৎ তিস্তার মনে হল সুমিতের মনে যদি কোন অস্বস্তি থেকে থাকে তবে সেটাকে সরিয়ে ফেলতে সাহায্য করা উচিত। ও যদি ওর মাকে বলে এসে শান্তি পায় তবে তাই যাক। তিস্তা বলল, 'বেশ, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

'যাব আর আসব। বড়জোর এক ঘণ্টা। ক'টা বাজে?'

'নয়।'

'দশ সোওয়া দশের মধ্যে ফিরছি। ঘুমিয়ে পড়ো না।

তিস্তা হাসল। তৈরি হয়ে সুমিত বেরুতে যাচ্ছিল তিস্তা ডাকল। সুমিত বলল, 'যাঃ পেছনে ডাকলে?'

তিস্তা এগিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেছিল। এই প্রথম কোন পুরুষ শরীরের গন্ধ তার সমস্ত সত্ত্বায় মিশে যাচ্ছিল। সুমিত ওকে চুম্বন করল। তিস্তা হেসে বলল, 'ওঃ, এরজন্যে এত !'

'তার মানে ?'

'তুমি এটা করতে চেয়েছিলে আর আমি বলেছিলাম বিয়ে করতে হবে।' এবার তিস্তা সক্রিয় হল। ব্যাপারটা যখন সেখানেই থেমে থাকল না তখন তিস্তা তাকে মনে করিয়ে দিল মায়ের কথা। নিজের জামার বোতাম খুলতে লাগল সুমিত, 'দূর শালা। মা ঠিক বুঝে নেবে। নো মোর যাওয়াযায়ি।'

এই ব্যাপারটা সেই মুহূর্তে অত্যন্ত ভাল লাগলেও পরে এ নিয়ে অনেক ভেবেছে তিস্তা। সুমিত কেন সেই রাত্রে যেতে চেয়েছিল ? কেউ যায় ? উত্তরটা পেতে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি।

একটা কেরাসিন স্টোভ পর্যন্ত বাড়িতে নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠে চা বানাবার ব্যবস্থা করা দরকার। কাছাকাছি চায়ের দোকান নেই। সুমিত বলল, 'মুখ ধুয়ে চল। দোকান থেকে চা খেয়ে আসি। চা নিয়ে আসব কিসে ?'

এ এক আলাদা ধরনের মজা। তিস্তার ভাল লাগল। দশটার মধ্যে স্নান করে তৈরি হয়ে ওরা যখন বের হল তখন সম্বল তিরিশ টাকাও নয়। ওরা দুজনে সরাসরি চলে এল কফিহাউসে। কফিহাউস তখনও জমে ওঠেনি। সুমিত বলল, 'আমরা রোজ এখানে এসে ব্রেকফাস্ট করতে পারি।'

'যতদিন টাকাটা থাকবে।' গম্ভীর গলায় বলল তিস্তা।

সুমিতের মুখ ভাবলেশহীন। একটু বাদে বলল, 'কলেজ যাবে না ?'

'আজ ইচ্ছে করছে না।'

'আমি ভাবছি কি হবে ? এই টাকায় তিনচার দিন চলবে। তারপর ?'

তিস্তা হেসে ফেলল, 'আমার কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না।'

সেদিন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ওরা কফিহাউসে ছিল। সেই প্রথম তিস্তা কফিহাউসের টয়লেট ব্যবহার করেছিল। উনিশ কুড়ি বছরের বন্ধুরা মিলে এক সঙ্গে আলোচনা করে গেল কি করে খাওয়াপরার সমস্যা মেটানো যায়। ধরিত্রী বলেছিল, 'ওইসব কবিতা মাইরি পকেটে টাকা না থাকলে অর্থহীন।'

'কোন কবিতা ?' জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করেছিল।

'ওই যে, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।'

সবাই হেসে উঠেছিল। শুধু সুমিত বলেছিল, 'বাড়ির ভাত খেয়ে সুখে ছিলাম, সর্বনাশ যে কি হল তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।'

তিস্তা প্রতিবাদ করেছিল, 'সুমিত !'

সুমিত সাততাড়াতাড়ি বলেছিল, 'সরি। উইথড্র করছি।'

বলরাম বলেছিল, 'তোরা টিউশনি করতে পারিস।'

তিস্তা বলেছিল, 'কে দেবে ?'

'পিসেমশাইকে বললে দমদমেই কটা পেতে পারিস।'

পাওয়া গেল। বলরামের পিসেমশাই নিজের দুই ছেলের জন্যে মাস্টার খুঁজছিলেন। মাসে তিরিশ টাকার বেশি দেবেন না। তাই সই। চারদিনের মাথায় যখন টাকা শেষ হয়ে গেল তখন সুমিত বলল, 'তুমি ভেবো না। আমি

কাজের চেষ্টা করছি।'

তিস্তা বলল, 'তাহলে আমি আর বের হচ্ছি না। বেরলেই তো খরচ।'

'ঠিক আছে। আমি তোমার খাবার নিয়ে ফিরব।'

সকালে ঘুম থেকে উঠেই সুমিত বেরিয়ে যায়। তিস্তা যায় বাড়িওয়ালার ছেলেদের পড়াতে। কারণ সেখানে এক কাপ চা মেলে। তারপর সারাদিন শুয়ে বসে থাকা। তিস্তা ভাবে মাইনে পেলে একটা স্টোভ কিনবে। জনতা স্টোভ। তাতে কিছু অন্তত ফুটিয়ে নেওয়া যাবে। সারাটা দিন কেটে যায়। সন্ধে হয়। খিদের পেট যে প্রতিবাদ তুলছিল তা একসময় শান্ত হয়ে যায়। রাত দশটা নাগাদ সুমিত ফেরে হাতে এক ভাড় তরকারি আর তিনটে রুটি নিয়ে। না, কোন কাজের খবর সে পায়নি। অনেক ঘুরেছে। কেউ কেউ আশা দেখিয়েছে। সুমিত জানায় সে খেয়ে এসেছে। তিনটে রুটি মুখে দিতে কষ্ট হয় তিস্তার। যদি সুমিত না খেয়ে আসে। তাকে সাধাসাধি করে একটা রুটি অন্তত খেতে। কোনদিন খায় কোনদিন খায় না সুমিত। দুটো রুটি আর তরকারিকে অমৃত বলে মনে হয় তিস্তার। জল খেয়ে সুমিতের বুকে মাথা রেখে শুয়ে মনে হয় স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো সেটা এখানেই। ভালবাসার জন্যে এক লক্ষ মাইল হেঁটে যেতে পারি, এক কোটি পদ্মের দিঘী ছেড়ে ভালবাসা তোমার জন্যে এতটুকু ঘাসফুল বুকে তুলে নিতে পারি। ভালবাসা তুমি আমায় রাজেন্দ্রাণী করেছ, আমার ভাঙ্গা দাওয়া আর রাজপ্রাসাদের কোন ফারাক নেই।

সারাদিন না খাওয়া আর রাত্রে দুটো বা তিনটে রুটি আর তরকারি খেয়ে বেঁচে থাকতে যে কষ্ট তা তিস্তার মনে একটুও রেখাপাত করছিল না। প্রতিদিন সে সুমিতকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে কিভাবে তার দিন কাটল, কি খেল ! শোনে, রোজই কোন না কোন বন্ধু পেট ভরে তাকে খাইয়েছে। মাস দুয়েক বাদে একটা লোভনীয় চাকরি পাওয়া যাবে। কিছু টাকা সে ধার করেছে বন্ধুদের কাছে। মাইনে পেলেই শোধ করে দেবে।

মাসের মাঝামাঝি আরও দুটো টিউশুনি পেল তিস্তা। সব মিলিয়ে মাসে একশ তিরিশ টাকা রোজগার। ওর মনে হতে লাগল অনেক টাকা। সারাদিন খিদে চেপে চেপে একসময় খাওয়ার ইচ্ছেটাই কমে যেতে লাগল। মাস শেষ হলে স্টোভ কেনা, নিত্যবাজার করা ছাড়া কফিহাউস এবং কলেজে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে এই চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকত সে। ওর যে ওজন কমছে, শরীর রোগা হচ্ছে, এ ব্যাপারে একটুও খেয়াল ছিল না তিস্তার। এর মধ্যে জয়ন্তী একদিন এল দেখা করতে। এসে অবাক হয়ে বলল, 'একি চেহারা হয়েছে তোর ?'

'কেন ? খারাপ লাগছে ?'

'কি রোগা হয়ে গেছিস ? খাওয়া দাওয়া করিস না ?'

'বাঃ, করব না কেন ?'

'বাড়িতে রান্না করিস ?'

'সামনের মাস থেকে করব।'

'শোন তিস্তা। তোর বাবাকে সব জানিয়ে চিঠি লেখ।'

'কেন ?'

'সুমিতের মায়ের ইচ্ছে তোর বাবা যদি ওঁকে এসে বলেন এই বিয়ে মেনে নিয়েছেন তাহলে তোকে ঘরের বউ করে নিতে কোন আপত্তি ওঁর নেই। এখন যে অবস্থায় কাটাচ্ছিস তার চেয়ে চিঠি লেখা ঢের ভাল।'

'আমি লিখলেই বাবা শুনবেন কেন ?'

'শুনবেন। তুই ওঁর মেয়ে। বাবারা চিরকাল মেয়েদের সবচাইতে বেশী ভালবাসে।'

'না। আমি লিখব না। মরে গেলেও না।'

'কেন ?'

'আমি বাবার অবাধ্য হয়েছি। আমার ওই চিঠি লেখার মুখ নেই।'

'তাহলে কি করবি ?'

'যা করছি। এ মাসটা কষ্ট করি।'

'ঠিক আছে। যদি টিউশুনিই করবি তাহলে ভাল টিউশুনি কর।'

'কোথায় পাব ?'

'দাঁড়া। আমাদের ক্লাশের লছমি আগরওয়ালা বলছিল ওর খুড়তুতো বোনকে পড়ানোর জন্যে ইংলিশ মিডিয়ামের মেয়ে ওরা খুঁজছে। কালই ওর সঙ্গে কথা বলে দেখি।' জয়ন্তী বলেছিল।

দুদিন বাদে সুমিত এসে খবর দিয়েছিল কফিহাউসে ওর সঙ্গে জয়ন্তীর দেখা হয়েছে। জয়ন্তী বলেছে তিস্তা যেন সামনের মাসের এক তারিখে বাড়িতে গিয়ে দেখা করে। এক ভদ্রলোকের এক মেয়েকে পড়াতে হবে। মাসে দু'শো টাকা পাবে। সপ্তাহে তিনদিন।

কেঁদে ফেলেছিল তিস্তা। দু'শো টাকা। মাসে বারো দিন। তার মানে সে হেসে খেলে সাড়ে তিনশ টাকা রোজগার করতে পারবে। সেটা হলে আর কোন সমস্যা থাকবে না। একটা স্টোভ, থালা বাসন, কেটলি কাপ ডিস আর খাট এবং আলনা কিনলে আপাতত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মাসে একশ টাকা ভাড়া দিতে হবে অবশ্য। প্রথম তিনচার মাস একটু কষ্ট হবে কিন্তু তারপর তো আর নয়। সুমিত নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা চাকরি ঠিক পেয়ে যাবে। কি অদ্ভুত নিশ্চয়তাবোধ তিস্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

মাসের শেষ দিকে তিস্তার একটু জ্বর হল। সেই সঙ্গে পেটে ব্যথা। সুমিতকে এই ছোট্ট সমস্যার কথা বলেনি সে। বেচারা বাড়ি ফিরেই গম্ভীর হয়ে থাকে। প্রথম প্রথম সে জিজ্ঞাসা করত ওই রুটি তরকারি সুমিত কিনছে কি করে।

ধার করা টাকায় কিনেছে শুনে খারাপ লাগত। প্রায়ই মনে করিয়ে দিত যেন এই কারণে সুমিত বেশী ধার না করে। এখন আর প্রশ্ন করে না। মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে যতই ধার করুক রুটি তরকারির জন্য কত আর খরচ হয়। মাইনে পেলে একটু একটু করে ধার শোধ করে দেবে।

কিন্তু জ্বর বাড়তে লাগল। তৃতীয় দিনে পড়াতে যেতে পারল না সে। সুমিত বেরিয়ে গেছে রোজকারমত চাকরির ধান্দায়। পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। মুখে কোন স্বাদ নেই। উঠে দাঁড়ালেই মাথা ঘুরে যাচ্ছে। দুপুরে

বলরামের পিসিমা খোঁজ নিতে এলেন। তিস্তার অবস্থা দেখে চমকে উঠলেন মহিলা। তিস্তা প্রচণ্ড চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারছে না। মনে হচ্ছে শরীর নিঙ্গড়ে নিচ্ছে কেউ। ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি পাড়ার ডাক্তারকে ডেকে আনলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, 'মনে হচ্ছে জন্ডিস হয়েছে। খুব খারাপ ধরনের জন্ডিস। সেই সঙ্গে পেটে আলসার হতে পারে। এখনই হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার।'

বলরামের পিসিমা ঘরোয়া ধরণের মহিলা। ডাক্তারকে ফি দিয়ে বিদায় করে আর এক ভাড়াটেকে ব্যাপারটা বললেন। তার ফলে বিকেল নাগাদ তিস্তা আর জি কর হসপিটালের জেনারেল বেডে শুতে পারল। সুমিত সেদিনও ফিরেছিল রাত দশটায় আলুপটলের তরকারি আর রুটি নিয়ে খবরটা পেয়ে ঘাবড়ে গিয়েছিল। অত রাত্রে হাসপাতালে গিয়ে কোন লাভ নেই জেনে তিস্তার ডায়েরি হাতড়েছিল। সেখানে তিস্তার কানপুরের ঠিকানা পেয়ে পরের দিন সকাল হতেই টেলিগ্রাম করেছিল, 'ডটার সিরিয়াসলি ইল। অ্যাডমিটেড ইন আর জি কর। কাম শার্প।'

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কিছুই টের পায়নি তিস্তা। কখন তাকে পেয়িং বেড থেকে কেবিনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা সে টের পায়নি। যখন কথা বলার অবস্থায় এল তখন বাবা চোখের সামনে। মা বাবার পাশে। পেছনে সুমিতও দাঁড়িয়ে। কেঁদে ফেলেছিল তিস্তা। চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে এসেছিল। ওর বাবার হাত এগিয়ে এসেছিল। মেয়ের ডান হাত আঁকড়ে ধরে ভদ্রলোক বিড়বিড় করেছিলেন, 'কেন এমন করলি! কেন?'

জবাব দিতে পারেনি তিস্তা। কিন্তু বুকের ভেতর এতদিন যেসব যুক্তি দিয়ে প্রতিরোধ তৈরি করে রেখেছিল তা এক লহমায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। তাকে ওইভাবে কাঁদতে দেখে নার্স এগিয়ে এল, 'না, আর নয়, এবার আপনারা বাইরে যান।'

'দিদি, চিড়িয়ামোড় এসে গেছে।'

বাস্তবে ফিরল তিস্তা। চারপাশে আলো জ্বলছে। রিক্সার হর্ন বাজছে এলোমেলো। বারাকপুরের চিড়িয়ামোড়ে ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে। সামনের লোকদুটো টাকা দিয়ে নেমে গেল নিঃশব্দে। তিস্তা ব্যাগ খুলল। বুড়ো সর্দারজি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কতদূরে যাবেন এখান থেকে?'

'নোনা চন্দনপুকুর।'

'বেশী ভেতরে না হলে আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

'না, না, আমি রিক্সা নিয়ে চলে যাব। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কত দিতে হবে?' পেছনের সিট থেকে মিটার দেখতে পাচ্ছিল না তিস্তা।

'তিরিশ দিন।'

'কি বলছেন? মাত্র ষাট টাকা উঠেছে?'

'না দিদি। তিন তিরিশ নব্বুই পেলে মিটারের অনেক বেশী আমি পেয়ে যাব। আপনি তিরিশই দিন।'

টাকাটা দিয়ে তিস্তা বলল, 'আপনি অদ্ভুত মানুষ!'

বুড়ো সর্দারজী হাসল, 'আমি নিজের ক্ষতি করিনি কিন্তু।'

রিক্সায় বসেও লোকটাকে ভুলতে পারছিল না তিস্তা। নিজের ক্ষতি না করেও কেউ তো অন্যের উপকার করে না। রেল লাইনের পাশ ধরে সিনেমা হাউসের সামনে দিয়ে লেবেল ক্রসিং-এর কাছে পৌঁছে দেখল সেটা খোলা। ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক থাকলে এখানে প্রায়ই জ্যাম হয়। অর্থাৎ এখনও ট্রেন চলাচল শুরু হয়নি। আনন্দপুরীর পাশ দিয়ে খানিকটা এগোতেই ক্ষিরোদ চক্রবর্তীর বাড়ি। তাঁর ভাইপো অসীম তাদের বাড়িওয়ালা। অসীমের স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন বারান্দায়। তিস্তাকে নামতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কিসে এলেন ভাই? শুনলাম ট্রেনে খুব গোলমাল হয়েছে।'

ভাড়া মিটিয়ে কাছে এসে তিস্তা বলল, 'হ্যাঁ।'

'দেখুন তো কি হবে!'

'কেন?'

'সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরবে বলেছিল, একটা নেমন্তন্ন রাখতে যেতে হবে। আপনি কি করে এলেন?' ভদ্রমহিলা খুবই উদ্বিগ্ন।

'আমি একটা গাড়ি পেয়ে গেলাম।' তিস্তা ঠোঁট কামড়ালো। ব্যথাটা আবার চাগিয়ে উঠেছে। কোমর থেকে তলপেটে নেমে যাচ্ছে পেঁচিয়ে। অসীমবাবুর স্ত্রী চমকে উঠলেন, 'কি হয়েছে আপনার?'

অনেক কষ্টে ভদ্রমহিলার সাহায্য নিয়ে তালা খুলে বাড়িতে ঢুকেছিল তিস্তা। আলো জ্বেলে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মিসেস চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কখন থেকে এমন ব্যথা হচ্ছে?'

'একটু আগে প্রথম টের পেলাম।' যন্ত্রণাটাকে সামলাতে চেষ্টা করছিল তিস্তা।

'আপনি এই অবস্থায় বেরিয়েছেন কেন?'

'অবস্থা? না, এখনও অনেক দেরি আছে। একবার ডক্টর মল্লিককে যদি ফোন করা যেত, আমি বুঝতে পারছি আপনার খুব অসুবিধে হচ্ছে!' তিস্তা হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল। কাউকে বিব্রত করতে তার কখনই ভাল লাগে না।

মিসেস চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। বিছানায় শুয়ে অরিত্রর কথা মনে হল তিস্তার। অরিত্র যদি পাশে থাকত। আকাশবাণীতে একটা খবর দিতে বলবে? কিন্তু ব্যথাটা একটু একটু করে কমে এল একসময়। কপালের ঘামও শুকিয়েছে। ধীরে ধীরে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল সে। সামান্য মাথা ঘোরা ছাড়া আর তেমন কোন অসুবিধে নেই। ঈশ্বর এ যাত্রায় বাঁচিয়ে দিলেন।

মিসেস চক্রবর্তী ফিরে এসে বললেন, 'আরে, উঠেছেন কেন?'

লজ্জিত হাসি হাসল তিস্তা, 'ঠিক আছি এখন।'

'ডাক্তার মল্লিক আসছেন।'

'ও।' তিস্তার মনে হল না বললেই ভাল হত। ট্যাক্সি ভাড়ার পর আরও কিছু বাড়তি টাকা যাবে। এখন তো অসুবিধে নেই।

'আপনার সাহস আছে।'

'কেন ?'

'এই স্টেজেও একা আছেন, অফিস করছেন।' মিসেস চক্রবর্তী বললেন 'আমি আকাশবাণীতেও টেলিফোন করে দিয়েছে।'

'ও ছিল ?'

'হ্যাঁ, বললেন কাজ শেষ করেই চলে আসছেন। আপনি বরং একটু বিশ্রাম নিন। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'না না। আমার এখন ভালই লাগছে।'

'আপনি পারবেন ?'

'নিশ্চয়ই।'

'তখন আপনার মুখের যা অবস্থা হয়েছিল ! আচ্ছা, ডক্টর মল্লিক এসে দেখুন আপনাকে তারপর যা ইচ্ছে তাই করবেন।'

ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। একই বাড়ি হলেও ভাড়াটে হিসেবে তাদের যাওয়া আসা এবং অন্যান্য স্বাধীনতা সম্পূর্ণ আছে। ভদ্রমহিলার সঙ্গে এতদিন শুধুই ভালো ভালো সম্পর্ক ছিল। হৃদ্যতা গড়ে ওঠার অবকাশ বা বাসনা কোনটাই হয়নি। আজ এমনভাবে ওঁকে এগিয়ে আসতে দেখে ভাললাগার সঙ্গে অস্বস্তিও কম হচ্ছিল না।

বাথরুম হল এমন একটা জায়গা যেখানে শারীরীক দুর্ঘটনার ষাট ভাগই ঘটে থাকে। শোওয়ার ঘরের মত বাথরুমকে ছিমছাম রাখার দিকে ঝোঁক তিস্তার অনেক দিনের। অরিত্র ঠাট্টা করে বাতিক বলে। নতুন সাবান ব্যবহার করে অরিত্র মোড়কটাকে মেঝেয় ফেলে রেখে গেছে। হেঁট হয়ে সেটাকে তুলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল তিস্তা। পায়ে করে সরিয়ে দিল একপাশে।

ডাক্তার মল্লিক এসে পড়লেন একটু বাদেই। মিসেস চক্রবর্তী তাঁর সঙ্গে। তিস্তাকে দেখেই ভদ্রলোক বললেন, 'কি হল ? এমন জরুরী হুমকি ?'

'হঠাৎ একটা ব্যথা— !' তিস্তা অপরাধীর হাসি হাসল।

'কখন থেকে ?'

প্রথম টের পাওয়ার সময়টা বলল তিস্তা। ডাক্তার মল্লিক ওকে বিছানায় শুইয়ে নানারকম পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, 'এখনও মাস দুয়েক বাকি। অনেক সময় টেনশনে এমনটা হতে পারে। একবার যখন হয়েছে তখন আর আপনি বাইরে বের হবেন না। ব্যথাটা যদি রিপিট করে সোজা আমার নার্সিংহোমে চলে আসবেন। আমি ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি।' প্যাড বের করলেন ভদ্রলোক। তিস্তা সেদিকে তাকাল, 'ভয়ে কিছু নেই তো ?'

'না মা। এখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাক আছে।'

'ডাক্তারবাবু, আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। কিন্তু পরেও তো অনেক ছুটি লাগবে। তিনমাসের বেশী তো পাব না।'

ডাক্তার মুখ তুললেন, 'এখন ঝুঁকি নিলে সেটায় দুটো প্রাণের ভালমন্দ জড়ানো থাকবে। পরে সেটা হবে আপনার একার। সিজার না হলে মাসখানেক বাদে অফিসে যেতে দিতে পারি।'

ওঁরা চলে গেলে প্রেসক্রিপশনের কাগজটা হাতে নিয়ে বসে থাকল তিস্তা। আজ বাড়িতে এসে কাজের মেয়েটাকে দেখতে পায়নি। নটায় ওষুধের দোকান

বন্ধ হয় এখানে। অরিত্র যদি তার মধ্যে না আসে তাহলে অন্তত আজকের রাত্রের জন্যে এই কাগজটার কোন মূল্য থাকবে না। তিস্তা কেঁদে ফেলল এবং তখনই দরজায় শব্দ হল। নিজেকে ঠিক করতে যেটুকু সময় তাতেই গলা পেল, 'বউদি!'

তিস্তা চোখ মুখে তাকাল। বাড়িওয়ালার কাজের মেয়েটি দাঁড়িয়ে, 'দিন।'

'কি?'

'মা বলল ওষুধ এনে দিতে হবে।'

'ও।' তিস্তা হেসে ফেলল। পৃথিবীটা এখনও হঠাৎ হঠাৎ ভাল হয়ে ওঠে।

'তোমাদের বাবু এসেছেন?'

'না।'

টাকা নিয়ে ওষুধ আনতে চলে গেল মেয়েটি। মিস্টার চক্রবর্তীর বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল তবু তিনি ফিরতে পারেননি। অরিত্র ফিরবে কি করে? সে যদি ট্যাক্সিটাকে না পেত, যদি সর্দারজী রাজী না হত, ভাবতেই গা কেমন করে উঠল। ওই যন্ত্রণা নিয়ে শেয়ালদা স্টেশনের জনস্রোতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারত তিস্তা?

ওষুধ পৌঁছে দিল মেয়েটা। এসে বলল, 'এইমাত্র বাবু এল। বাসে এসেছে। ট্রেনে নাকি খুব গোলমাল।'

'জানি।'

'আচ্ছা বউদি, একটা কথা বলব?'

'কি কথা?'

'আপনার শ্বশুরবাড়ির কেউ নেই?'

'থাকবে না কেন?'

'নিজের মা বাবাও তো আছে!'

'হুম্।'

'তাদের কাছে চলে যাচ্ছেন না কেন? আমরা এত গরীব তবু এসময় ঘরে মেয়ে এলে বুকে করে আগলে রাখি।'

তিস্তা হেসে ফেলল, 'ভেবেছিলাম ছুটি নেবার পর মায়ের কাছে যাব।'

'তাহলে মাকে আসতে লিখুন। এই সময় ব্যাটাছেলে কি বুঝবে?'

মেয়েটি চলে যাওয়ার পর ওষুধ খেল তিস্তা। খিদে পাচ্ছে বেশ। খালি পেটেই খেল। সকালে বিকেলের তরকারি রেঁধে গিয়েছিল। রাত্রে রুটিটা তৈরী করিয়ে নেয়। আজ কি হবে। এত অবসন্ন লাগছে যে রান্নাঘরে যাওয়ার ইচ্ছে একটুকুও নেই। অরিত্র যদি দশটার মধ্যে আসে তাহলে দোকান থেকে রুটি কিনে আনতে পারে। চুপচাপ শুয়ে পড়ল তিস্তা। শুতে বড় স্বস্তি।

'একি দরজা বন্ধ না করে ঘুমিয়ে আছ?'

পাল্লার আওয়াজে ঘুম ভাঙতেই তিস্তা প্রশ্নটা শুনতে পেল। অরিত্র দাঁড়িয়ে আছে খাটের পাশে। অরিত্রকে চিনতেই যেন একটু সময় গেল। এর মধ্যে অরিত্র নিজেকে শুধরেছে, 'কি হয়েছে? কেমন আছ?'

তিস্তা উঠে বসল, 'ঠিক আছি।'

'মিসেস চক্রবর্তীর টেলিফোন পেয়ে আমি তো ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তুমি কি করে বাড়ি ফিরলে? ওঃ, আজ যা স্টেশনে মারপিট। আমি তো অফিসের গাড়িতে ফিরলাম।' অরিত্র জোরে জোরে কথা বলছিল।

'এখন কটা বাজে?'

'এখন?' ঘড়ি দেখল অরিত্র, 'বারোটা বাজতে তিন।'

তিস্তা হেসে ফেলল। জামা ছাড়তে ছাড়তে অরিত্র বলল, 'হাসছ যে!'

'তুমি খবর পেয়েই চলে এলে বোধহয়!'

'হ্যাঁ। স্টেশনে গিয়ে দেখি ট্রেন বন্ধ। বাসে ওঠা যাচ্ছে না। আবার অফিসে ফিরে গেলাম। কয়েকজন স্টাফকে এদিকে পৌঁছাতে আসছিল তাই চলে আসতে পারলাম। ডাক্তার এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কি বলল!'

'ভয় নেই, মরব না।'

'বুঝলাম। ঠিক কি হয়েছিল?'

'পেইন।'

'সেকি? এখনই?'

'জানিনা।'

'তুমি তোমার মায়ের কাছে চলে যাও এবার।'

'থ্যাঙ্কস।'

'আচ্ছা, আমি যাই বলি তাই তোমার খারাপ লাগে কেন বলতো?'

'বলার মধ্যে আন্তরিকতা থাকে না বলে।'

অরিত্র পাশে এসে বসল। একটা হাত তিস্তার কাঁধে রাখল, 'যদি দুঃখ পেয়ে থাকো তাহলে সত্যি আমি দুঃখিত। আসলে আমি ঠিক নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারি না বলে—।' অরিত্র থেমে গেল।

হঠাৎ কি হল, ভীষণ একা লাগতে লাগতে হয়তো সামান্য স্পর্শ অনেকটা পাওয়ার স্বাদ এনে দেয়। তিস্তা অরিত্রর হাতে গাল রাখল। সেই উষ্ণতায় যে আরাম তাতে তার চোখ বুঁজে গেল। অরিত্র জিজ্ঞাসা করল,'খেয়েছ?'

কথা না বলে মাথা নেড়ে সত্যিটা জানাল তিস্তা।

'সেকি? রান্না হয়নি? টগরের মা আসেনি?'

'আমি যখন ফিরেছি তখন ও ছিল না।'

'তাহলে বাড়িতে খাবার নেই?' হাত সরিয়ে নিল অরিত্র।

'ভেবেছিলাম তুমি তাড়াতাড়ি ফিরলে রুটি কিনে আনতে বলব।'

'আশ্চর্য!'

'তার মানে?'

'আমরা দোকানের রুটি খাই?'

'এখন খাই না। কিন্তু না খাওয়ার কিছু নেই।'

'তুমি কখন ফিরেছ?'

'আটটার মধ্যে।'

'সেকি ? কিসে এলে ?'

'ট্যাক্সিতে।'

'মাইগড। তিস্তা আমি বুঝতে পারি না মাঝে মাঝে তোমার মধ্যে পুরোন ভূতটা কি করে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ! এখন ট্যাক্সিতে চড়া একদম লাক্সারি ছাড়া কিছু নয়। বাচ্চা হতে কত খরচ হবে কে জানে।' অরিত্র উত্তেজিত গলায় বলল।

'পাঁউরুটি আছে। তাই দিয়ে তরকারি খেয়ে নাও। আমার ঘুম পাচ্ছে।' পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল তিস্তা।

খাওয়ার ব্যাপারে অরিত্র একটু বিলাসী। মাঝে মাঝে মনে হয় খুব কম পুরুষই খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে নির্লিপ্ত। আজকাল ছুটি থাকলে রান্না করতে ভালই লাগে তিস্তার। সেদিন অফিসে কথা হচ্ছিল। গত তিরিশ বছরে মেয়েদের যেমন অনেক কিছু বদলে গিয়েছে তেমনি রান্নার ধরনেও পরিবর্তন এসেছে। মা ঠাকুমাদের হাতের রান্না ছিল অসাধারণ। এটা মেনেও বলতে হয় তাঁদের এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ ছিল না। বড়ির ঝোল, সুক্তো অথবা মুড়োঘন্ট তাঁরা অসাধারণ রাঁধতেন কিন্তু ওগুলো থেকে আর একটা পদ তৈরীর কথা খুব কম মহিলাই ভাবতে পারতেন। তখন ডিমটাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হত না। এখন ওই এক ডিম দিয়েই কত রকমের খাবার তৈরী করতে পারে একালের মনোযোগী মহিলারা। অথচ স্কুলজীবন পর্যন্ত রান্নাঘরে ঢোকার দরকার হয়নি। পরে কখন কেমন করে একটু একটু নাড়াচাড়া করতে করতে ব্যাপারটা আয়ত্তে এসে গেল তা নিজেরই জানা নেই। এখন কেউ খেতে ভালবাসলে তাকে ভালমন্দ রেঁধে খাওয়াতে ইচ্ছে হয়। আজ এত কাণ্ডের পরেও অরিত্র শুধু রুটি আর ঠাণ্ডা তরকারি খাচ্ছে বলে মন খারাপ হয়ে গেল তিস্তার। নিজের খিদের কথা মনে রইল না।

মাঝরাত্রে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল তিস্তা। দেখে হাঁসফাস করে উঠে বসল। স্বপ্নে সে ধরিত্রীকে দেখতে পেয়েছিল। সেই ধরিত্রী। কলেজ জীবনে যে ছিল নারীপ্রগতির সপক্ষে বলিয়ে মেয়ে। অনেককাল হয়ে গেল ধরিত্রীর সঙ্গে দেখা নেই। দেখা নেই জয়তীর সঙ্গেও। বিয়ে থা করে পুনায় চলে গিয়েছে। ঠিকানাও জানা নেই যে চিঠিপত্র দেবে। ধরিত্রীর বিয়ের ব্যাপারটাও অজানা। স্বপ্নে ধরিত্রীকে দেখল একটি মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করতে। লোকটা যে ওর স্বামী তা বুঝতে পারছিল। হঠাৎ কোথা থেকে লোকটা একটা লোহার বেড়ি এনে ধরিত্রীর পায়ে পরিয়ে দিয়ে বিছানায় আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ল। ধরিত্রী রাগত চোখে তাকে দেখল। তারপর হামাগুড়ি দেবার মত হেঁটে এক ক্যান পেট্রল বিছানায় উপুড় করে দিয়ে দেশলাই জ্বেলে দিল। দাউদাউ আগুনের মধ্যে লোকটা জ্বলে যাচ্ছিল। সেটা দেখামাত্র ঘুম ভেঙ্গে গেল তিস্তার। নীল আলো জড়ানো ঘরে সে চারপাশে তাকাল। অরিত্র ওপাশে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে আছে। এই ঘর তাদের ঘর।

কিন্তু এমন স্বপ্ন দেখল কেন ? ধরিত্রী বা এতকাল পর আসবে কেন তার স্বপ্নে ? অরিত্রর দিকে তাকাল সে। স্বামীর সম্পর্কে সে কি মনে মনে এতটা তিক্ত হয়ে গেছে যা স্বপ্নে প্রতিফলিত হচ্ছে ? সে কি কখনও ঘুমন্ত অরিত্রকে

পুড়িয়ে মারতে পারবে ? অসম্ভব। তাছাড়া কেন সেটা করবে ? এ ধরনের স্বপ্ন দেখা মানে নিজের মানসিক বিকৃতি ছাড়া কিছু নয়।

অরিত্রর কিছু কিছু ব্যবহার তার ভাল লাগে না, এটা ঠিক কথা। খুঁটিয়ে দেখলে ওর ব্যবহারে অনেক ত্রুটি পাওয়া যাবে। যাকে বলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানুষ অরিত্র প্রায় তাই। নিজের ভাল বুঝে নিতে ওর জুড়ি নেই। কিন্তু তার বাইরে ও খুব স্বাভাবিক। যে কোন বিষয় নিয়ে কথা বললে ওর বুদ্ধিদীপ্ত মনের ছবি চমৎকার পাওয়া যায়। কোন মানুষ সম্পূর্ণ নিটোল হয় না। অনেকেরই অনেক রকম খামতি থাকে। তিস্তার নিজেরই কি তা নেই ? অতএব অরিত্রর ব্যবহারে যা কিছু অপছন্দ তা বাদ দিয়েই ওকে সে গ্রহণ করেছে এবং করে যাবে। অন্তত এটুকু কারণের জন্যে ধরিত্রীদের দলে সে কখনও সংখ্যা বাড়াতে পারে না।

ঘুমন্ত অবস্থায় অরিত্র মুখ ফেরাল। গাল রাখল কনুইতে। এখন ও কাদা। আর ওর এই ভঙ্গী দেখে কেঁপে উঠল তিস্তা। চট করে তার সামনে সুমিত চলে এল। ঘুমাবার সময় এটা খুব প্রিয় ভঙ্গী ছিল সুমিতের। একটু আলাদা, একদম একা শোওয়ার অভ্যেস সুমিতের, বলত কেউ গায়ের পাশে শুলে ওর ঘুম আসেনা। হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনের বিছানাহীন মেঝেতেও ও সেই অভ্যেসটা চালু রেখেছিল। যতক্ষণ শরীরের প্রয়োজন ততক্ষণ জড়িয়ে থাকা, তারপর একা আলাদা হয়ে যাওয়া।

হাসপাতালেই বেশ রোগা হয়ে গিয়েছিল তিস্তা। যেদিন রিলিজ অর্ডার পেল সেদিন বাবা বললেন, 'মা, তোর সুখের জন্য আমাকে যা করতে বলবি আমি করব। সুমিতকে আমার খারাপ লাগেনি। শুধু ও চাকরিবাকরি করে না, মা-বাবার ওপর নির্ভর করে আছে এইটেই মেনে নিতে পারছি না। তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?'

কেবিনে বাবার সঙ্গে মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। তিস্তা মাথা নেড়েছিল।

'সমস্ত ছেলেবেলা ধরে তোকে আমি যে শিক্ষা দিয়েছিলাম তা কি বৃথা হয়ে গেল ?' প্রৌঢ় অদ্ভুত চোখে তাকিয়েছিলেন।

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে আবার না বলেছিল তিস্তা।

'তুই এরকম কাণ্ড তাহলে কি করে করলি ?'

খানিকক্ষণ চুপ করেছিল তিস্তা। তারপর বলেছিল, 'উত্তরটা পরে দেব বাবা।'

মা এবার কথা বললো, 'তোমার আর দমদমে থাকা চলবে না।'

বাবা বললেন, 'ওকে সব বল।'

মা বললেন, 'গতকাল সুমিতের সঙ্গে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওর মায়ের সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি বললেন আমাদের আপত্তি না থাকলে তাঁরও তোকে ছেলের বউ হিসেবে গ্রহণ করতে আপত্তি নেই।'

তিস্তা ঠোঁট কামড়েছিল।

বাবা বলেছিলেন, 'আমার তো ভদ্রমহিলার কথাবার্তা খারাপ লাগেনি। ছেলে না বলে বিয়ে করেছে তবু একটুও রাগ নেই। বললেন, আপনাদের মেয়ে, আপনারা অনুমতি না দিলে আমরা কেন গ্রহণ করব ? ঠিক কথা।'

সেদিন সুমিত হাসপাতালে আসেনি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বাবা মা তাকে নিয়ে সুমিতের বাড়িতে গেলেন। ওর মায়ের ব্যবহার দেখে মনেই হল না একদিন তিনি দরজা থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। দুহাতে জড়িয়ে বুকে টেনে নিলেন। আন্তরিক গলায় বললেন, 'ওম্মা, কি চেহারা করেছিস তুই! আহারে।'

বাবা বললেন, 'খুব খারাপ ধরনের জন্ডিস হয়েছিল।'

'তাতো দেখেই বুঝতে পারছি। দ্যাখো কাণ্ড। সুমিত তো একবারও বলেনি।' ভদ্রমহিলা ওর মাথায় কাঁধে হাত বোলাচ্ছিলেন।

বাবা বললেন, 'জামাই কি এসেছে?'

'নাঃ। সে সেই দুপুরে চরতে বেরিয়েছে।' সুমিতের মায়ের গলা পাল্টানো।

মা বললেন, 'ও বোধহয় জানে না আজ হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে।'

সুমিতের মা বললেন, 'ঠিক জানে। যেমন বাপ তেমন ছেলে তো!'

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, বেয়াইমশাই-এর সঙ্গে আলাপ হল না!'

'কি জানি কোথায় গেছে!'

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় আপনার আমার একটা উৎসব করা উচিত।'

'কিসের?'

'আপনার ঘরে পুত্রবধূ এল। আমার মেয়ে পাত্রস্থ হল।'

'এটা অবশ্য খারাপ বলেননি। আত্মীয়স্বজনদের তো জানি। কুৎসা গাইতে জিভ লক লক করবে। যতই করুন ওদের মন পাবেন না। তা সেসব করতে অনেক খরচ। দিনকাল যা পড়েছে।'

'আমি তৈরী আছি। তাছাড়া আপনি যদি ছেলের জন্যে—'

'একটা কুটোও নয়। ওই অপদার্থ ছেলেকে কিছু দেবেন না।'

'তবু খাট বিছানা, ঘড়ি আংটি—।'

'একদম নয়। বউভাত বলুন আর যাই বলুন তার খরচটা দিলেই হবে।'

'সেটা কত?'

'এইরে। এখনই কি করে বলি। আমার এক ভাই আছে। এসব করায় সে ওস্তাদ। তার সঙ্গে কথা বলে বলব। আপনি, মানে, আপনারা কোথায় উঠেছেন?'

মা বললেন, 'আমার বোনের বাড়ি নাকতলায়।'

বাবা বললেন, 'আমার রিটায়ারমেন্টের বেশী দেরি নেই। সঞ্চয়ের চেষ্টা তো কখনও করিনি। তবু কলকাতার দুই প্রান্তে দুটুকরো জমি কিনে রেখেছিলাম।'

'কোথায়?'

'একটা বেলেঘাটায়। আর একটা শ্যামনগরে।'

'বাড়ি করবেন?'

'সেরকমই ইচ্ছে। গিন্নীর ইচ্ছে শ্যামনগরেই বাড়ি করি। বেলেঘাটা বড্ড ঘিঞ্জি এলাকা, মানুষের ভিড়। আসলে এতকাল ফাঁকায় থেকে অভ্যেস তো!'

'তা ভাল। আপনি কালকে যোগাযোগ করুন। আমি এর মধ্যে ভাই-এর

সঙ্গে কথা বলে রাখব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার মেয়েকে আমি প্রথম দিনেই মেয়ে বলে ডেকেছি। ও আমার মেয়ে।'

খুশী হয়ে বাবা মা চলে যাওয়ার পর হঠাৎ কান্না পেয়েছিল তিস্তার। শাশুড়ি বলেছিলেন, 'ওমা, এতকাল স্বামীর সঙ্গে কাটিয়ে এখন কান্না কেন? শোন মেয়ে, তোমাকে একটা কথা বলি। তোমার স্বামীকে আমি পছন্দ করিনা। ওর বাপও যেমন ও তেমন। তুমি যদি আমার মেয়ে হিসেবে এ বাড়িতে থাকতে পার তাহলে আমি তোমাকে মাথায় করে রাখব। বুঝেছ?'

কথাটার মানে কি বুঝতে পারেনি তিস্তা। অনেকদিন বাদে হাসপাতালের বিছানার বাইরে অনেকক্ষণ একা বসে থাকতে থাকতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই নিষ্কৃতি পেতেই মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেছিল।

শাশুড়ি এতে খুশী হলেন খুব। জড়িয়ে ধরে তাকে নিয়ে এলেন সুমিতের ঘরে। বললেন, 'এই ঘর তোমার। তুমি যদি আমার মন বুঝে চল তাহলে কোন কাজ করতে হবে না তোমাকে।'

হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে রাখা তার জিনিষপত্রকে এঘরে দেখতে পেল তিস্তা। শাশুড়ি চলে যাওয়ার পর সে চেয়ারে বসেছিল। সুমিতকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিলো তার। এই সময় একটি মহিলা ঘরে এল। বছর পঁয়ত্রিশের কালো খুব স্বাস্থ্যবতী চেহারার মহিলাটি যে কাজের মেয়ে তা বুঝতে পারল তিস্তা। মহিলার হাতে একটা থালা। তাতে সুজি এবং রসগোল্লা।

মহিলা বলল,'আমার নাম মঙ্গলা। তুমি তো মাস্টারনি থেকে বউ হয়ে এলে এ বাড়িতে। দুমাস ছিলাম না বলে দ্যাখোনি। আমি গিন্নীমার খাসলোক। বুঝলে?'

তিস্তা মাথা নেড়েছিল।

মঙ্গলা থালাটা একটা টেবিলে রেখে বলেছিল, 'অমন লক্কা পায়রাকে মন দিলে কি করে বউ?'

'মানে?'

'ছোটবাবুর কথা বলছি।'

তিস্তা জবাব দিতে পারল না। মঙ্গলা হাসল, 'বাবু যে বাবু, তিনিও কাল রাত্রে বললেন, মঙ্গলা, ও ছোঁড়াও সুন্দরী বউ পেয়ে গেল! আমাদের দেশটার কি অবস্থা হল রে!'

তিস্তা অবাক, 'একথা বললেন কেন?'

'আর কেন? বুড়োর সারাজীবনের শখ তোমার মত ফর্সা সুন্দরী বউ-এর। নাও, খেয়ে নাও। আমার হয়েছে মরণ। সব দিক সামলাতে হয়।'

'তুমি এখানে অনেকদিন আছ?'

'তা আট বছর। আমার আগে ছিল গণেশের মা। আট বছর ধরে এ বাড়ির হাল ধরে আছি আমি। জয়নগরে বাড়ি। জমি জমা ছেলেমেয়ে সব সেখানে।'

'তুমি এখানে পড়ে আছ কেন?'

'ওমা! একি কথা। পড়ে আছি কিগো। না থাকলে এ বাড়ি অচল। থাকো কদিন বুঝতে পারবে। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব করতে হয়।

হ্যাঁ। তোমার বর যদি খারাপ ব্যবহার করে আমাকে বলো, আমি এমন দাওয়াই দেব যে ঠিক হয়ে যাবে।'

'তোমার কথা সুমিত শোনে?'

'একশ বার। এই আটবছরে মাত্র একদিন আমার সঙ্গে দেখা করেনি।'

'একদিন?'

'হ্যাঁ। যেদিন তোমরা ঘর ভাড়া নিয়ে গিয়েছিল।'

'তাছাড়া?'

'রোজ সকালে আসত। খেতো ঘুমাতো। রাত্রের খাওয়া খেয়ে পয়সা নিয়ে চলে যেত তোমার ওখানে শুতে।'

'কি?' হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল তিস্তা।

'ওমা, তুমি জানো না?'

'সুমিত রোজ এখানে আসত?'

'হ্যাঁ। আমি স্নান করিয়ে না দিলে বাবুর মন ভরে না

'ও এখানে এসে স্নান করত?'

'হ্যাঁ।'

তিস্তার মাথা ঘুরতে লাগল। সুমিত রোজ সকালে স্নান সেরে বেরিয়ে যেত চাকরির সন্ধানে। ওর মনে হল মঙ্গলা মিথ্যে বলছে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল সে। বলল, 'ওর মা ওকে পছন্দ করেন না।'

'তা করবেন কেন? সুমিত যে ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করে।'

'কেন করে?'

'পয়সাকড়ির জন্যে। মায়ের দুর্বলতা তো জানে।'

'কি সেটা?'

'না বাবা। প্রথম দিনেই সব জেনে যাবে তা হবে না। জানলে গিন্নী আমাকে ছেড়ে দেবে না। এই যে আমি লাঠি ঘোরাই সেটা গিন্নী হতে দিচ্ছে যে কারণে সেটা তোমাকে বলব কেন এত শিগগীর। গিন্নীর দুচক্ষের বিষ ওঁর স্বামী। তাকে ঠাণ্ডা করতে হয় আমাকে। বিষ নেই শুধু কুলোপনা চক্কর। আর সেটা করি বলে গিন্নী আমাকে তোয়াজ করে। তা তোমাকে বলি নতুন বউ, এ বাড়িতে যদি থাকতে চাও তো গিন্নীর মন জয় করো। সুমিতকে পাত্তা দিও না।'

'ও আমার স্বামী, ওকে আমি ভালবাসি।'

'তাহলে মরেছ।'

হঠাৎ বাইরে থেকে সুমিতের মায়ের গলা পাওয়া গেল। চিৎকার করে তিনি মঙ্গলাকে ডাকছেন। মঙ্গলা বলল, 'অশান্ত হয়েছে। যাই। খেয়ে নাও।'

খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না বিন্দুমাত্র। হাসপাতাল থেকে যে ডায়েট চার্ট দিয়েছিল তাতে ঘিয়ে ভাজা সুজি নেই। তা ছাড়া সে ভাবতেই পারছিল না সুমিত রোজ সারাদিন এ বাড়িতে আরাম করে গিয়েছে আর সে হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে না খেয়ে থেকেছে। তার মনে হচ্ছিল মঙ্গলা মিথ্যে বলেছে। এই যৌবনবতী এবং অসুন্দরী দাসীটির মতলব ভাল নয় বলে মনে হচ্ছিল তার। এমন সময় বাইরে পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল, 'আমার পুত্রবধূ, অথচ আমি দেখব

না। তোর গিন্নী মা ভেবেছে কি ?'

মঙ্গলার গলা কানে এল, 'ভদ্রভাবে কথা বলবে। শিক্ষিত মেয়ে।'

'আমি অশিক্ষিত নাকি ? আই অ্যাম এ ল-ইয়ার।'

তারপর দরজায় সুমিতের বাবাকে দেখতে পেল তিস্তা। রোগা, লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা একটি মানুষ অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছেন। মঙ্গলা বলল, 'তোমার শ্বশুরমশাই।'

'তিস্তা উঠল। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল। ভদ্রলোক বললেন, 'এ যে দেবী।'

'সুমিতের বউ।' মঙ্গলা বলল।

'হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে দেবী। হোল লাইফ, বুঝলে বউমা, আমি তোমার মত একটি মেয়েকে স্বপ্নে দেখে এসেছি। আমি পাইনি কিন্তু আমার ছেলে পেল। দ্যাটস মাই স্যাটিসফ্যাক্শন্।'

'এবার ঘরে যেতে হবে। বউমা বিশ্রাম নেবে।' মঙ্গলা হাত ধরে টানল।

'না, আমি যাব না।'

'তাহলে কিন্তু আমি ঘুম পাড়িয়ে দেব না।' চোখ রাঙাল মঙ্গলা।

তৎক্ষণাৎ একেবারে যন্ত্রের মত ফিরে গেলেন সুমিতের বাবা।

তিস্তা চুপচাপ তাকিয়েছিল। ভদ্রলোক অ্যাবনর্মাল। কিন্তু তাই যদি হয় তা হলে তিনি কোর্টে যান কি করে ? পৃথিবীর যেসব শ্বশুর বউমাকে দেখে সবার সামনে বলে তোমার মত একজনকে চেয়েছি এবং পাইনি তাদের মস্তিষ্ক সম্পর্কে সন্দেহ হবেই। কিন্তু এটা পরিষ্কার, ভদ্রলোকের ওপর মঙ্গলার প্রভাব প্রচণ্ড। মঙ্গলা ওঁকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় ? কি কাণ্ড !

সুমিত এসেছিল সওয়া নটা নাগাদ, কফিহাউস বন্ধ হলে। ততক্ষণ ওই ঘরে একদম একা ছিল তিস্তা। কিছু করার নেই বলে সুমিতের বইপত্র উল্টোচ্ছিল। সেইসময় অদ্ভুত কিছু দেখতে পায়নি কিন্তু একটা আবিষ্কার করেছিল। সুমিতের একটি বাঁধানো খাতা আছে। তাতে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত মেজর গল্প উপন্যাসের সম্পর্কে প্রকাশিত সমালোচনাগুলোর সারাংশ লেখা আছে সযত্নে। কোন কোনটা উপন্যাসের পেছন কভারে ছাপা সারমর্ম। অর্থাৎ সুমিত এইসব লেখা পড়েছে বলে যে দাবী করে তা ঠিক নয়। ওই লেখাগুলোর ওপর যে সমালোচনা ওর চোখে পড়েছে তাই সংগ্রহ করে নিজের পাণ্ডিত্য জারি করে। ব্যাপারটায় এক ধরনের তঞ্চকতা থাকলেও তিস্তার মনে হল এ টুকু করতেও তো বেশ উদ্যমের দরকার হয়। কজন ছেলে বা মেয়ে এতটা পরিশ্রম করে ? এই ঘরে একটাও ইংরেজি বই নেই।

রাত্রে সুমিত ঘরে ঢুকে হাসল, 'দেবী স্বস্থানে এলেন।'

হঠাৎ খুব অভিমান হল তিস্তার। সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

'কি হল ? ও, আজ হাসপাতালে যাইনি বলে রাগ করেছ। প্ল্যান করে, বুঝলে, ইচ্ছে করে যাইনি। তোমার বাবা যাতে একা নিজের মেয়েকে আমার মায়ের হাতে তুলে দেন তাই সরে থেকেছি। আমি সামনে থাকলে মা বিগড়ে যেতে পারত।' জড়িয়ে ধরতে চাইল সুমিত।

'না, ছোঁবে না তুমি।' ত্রস্তে সরে গিয়েছিল তিস্তা।

'কেন ? আমার অপরাধ ?'

'তুমি আমাকে ঠকিয়েছ !

'আমি ? তোমাকে ? এর মধ্যেই ? যা তা বলছ !'

'তুমি রোজ চাকরি খোঁজার কথা বলে এ বাড়িতে এসে দুবেলা খাওনি ? এখানে স্নান করোনি ? দুপুরে ঘুমাওনি ? কফিহাউসে আড্ডা মারোনি ? বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আমার জন্যে রুটি তরকারি কিনে এমন ভাব দেখিয়েছ কত ক্লান্ত ! জিজ্ঞাসা করলে বলেছ, বন্ধুবান্ধবরা খাইয়েছে তোমাকে ? বলোনি ?'

প্রথমটায় অবাক হলেও পরের দিকে অদ্ভুত শান্ত মুখে হাসতে লাগল সুমিত। তিস্তা থামলে বলল, 'মিথ্যে কথা বলেছি বলতে পারো কিন্তু ঠকাইনি। মিথ্যে যুধিষ্ঠিরও বলেছিল। ওই দুটো জিনিষ এক নয়।'

'তুমি এমন করতে পারলে ?'

'কেন, অন্যায় কি আছে ?'

'আমি সব কিছু ছেড়ে না খেয়ে ওখানে পড়েছিলাম কারণ আমরা— ।'

'দ্যাখো, যতক্ষণ তুমি না জেনেছ যে আমি এ বাড়িতে খেয়েছি ততক্ষণ তোমার মনে হয়েছে আমিও স্ট্রাগল করেছি। হয়েছে তো ? নাও, ফরগেট ইট। কিন্তু কথা হল, এ বাড়িতে ঢোকামাত্র এ সব কথা তোমার কানে কে দিল ? মাতৃদেবী ?'

'তাতে তোমার দরকার কি ?'

হঠাৎ বাঁ হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে সজোরে একটা চড় মারল সুমিত তিস্তার গালে, 'এ বাড়িতে আমার সঙ্গে ওই ভঙ্গীতে কথা বলবে না।'

তিস্তা পাথর হয়ে গেল। সেই প্রথম কেউ তাকে শরীরে আঘাত করল। আজন্ম এমন অভিজ্ঞতা ছিল না তার। সুমিত ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ বসেছিল তিস্তা। তার চোখে একটু জল এল না। শুধু অবাক, আরও অবাক হয়ে যাচ্ছিল সে।

রাত্রে পাশে শুয়ে সুমিতই কথা বলল, 'আই অ্যাম সরি। নীল রক্ত আছে তো শরীরে, মাথা ঠিক রাখতে পারিনি।'

'নীল রক্ত !' প্রশ্নটা আপসেই বেরিয়ে এসেছিল ঠোঁট থেকে।

'ব্যাভিচার। পুরোন যুগ থেকে চলে আসছে। আমাদের বাড়ি মাতৃতান্ত্রিক। মাতৃদেবীই সব। মায়ের শাশুড়িও তাই ছিলেন। তিনিই সব শিখিয়ে দিয়ে গেছেন মাকে। হয় তো মা তোমাকে সেটা শিখিয়ে দেবে। আগে প্রচুর বিষয়সম্পত্তি ছিল। কুঁজোর জল গড়িয়ে খেতে খেতে এখন প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। আমার বাবা যে কি করে ল পাশ করেছিলেন তা ঈশ্বর জানে। তিনিই প্রথম এ বাড়ির গ্র্যাজুয়েট। বাবার কোনও ক্লায়েন্ট নেই। ব্রিফলেশ উকিল। কোর্টে যাওয়া আসা সার।'

'উনি এসেছিলেন এ ঘরে।'

'অ। মঙ্গলা এসেছিল ?'

'হ্যাঁ। এ বাড়িতে মঙ্গলার ভূমিকা কি ?'

হেসে উঠল সুমিত, 'তুমি তো দুমাস অমিতকে পড়িয়ে গিয়েছ। কিছু টের পেয়েছিলে তখন ? পাওনি। বাইরের লোকেরা কিছুই বুঝবে না। এমন

ট্রেনিং। আমার কাছে না শুনে নিজেই একটু একটু করে জেনে নাও।'

'মঙ্গলার কাছে তুমি স্নান করতে?'

'এ গল্পও শুনে ফেলেছ? পুরোন অভ্যেস। ছেলেবেলা থেকে স্নান করাতো।'

'ছেলেবেলা? মঙ্গলা এ বাড়িতে এসেছে আট বছর আগে।'

'ওই তখন থেকেই। এখন অমিতকে রোজ করায়।'

মাথামুণ্ডু বুঝে পাচ্ছিল না তিস্তা। অমিতের বয়স বারো হয়ে গিয়েছে। অত বড় ছেলেকে স্নান করাবে কি। হঠাৎ গা ঘিনঘিন অনুভূতি ছড়ালো। সেইসময় সুমিত তাকে জড়িয়ে ধরতেই সে খুব শান্ত গলায় বলল, 'হাসপাতাল থেকে বলে দিয়েছে এখন এসব নয়।'

'কেন?'

'অসুখের পরেও শরীরে কিছু জার্ম থেকে যায়।'

'চমৎকার। তোমার সংক্রামক রোগ হয়েছিল নাকি?'

'আশ্চর্য! আমি সম্পূর্ণ সুস্থ নই।' তিস্তা উঁচু গলায় বলামাত্র দরজায় শব্দ হল। সুমিত জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

'আমি।' অমিতের গলা।

'কিরে?' সুমিত প্রশ্ন করল।

'মা বলল আজ বউদিকে আমার ঘরে শুতে।'

হঠাৎ প্রচণ্ড রেগে একটা লাথি মারল সুমিত। শেষ সময়ে সরে না গেলে মারাত্মক আহত হতে পারত তিস্তা। একটুও দেরি না করে সে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলতেই হাফ প্যান্ট পরা অমিতকে দেখতে পেল। তাকে বেরুতে দেখে অমিত হাঁটতে লাগল। তিস্তা ওকে অনুসরণ করছিল। একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অমিত বলল, 'মা, বউদিকে ডেকে এনেছি।'

'তুমি যাও। বউমা দাঁড়াও।' ঘরের ভেতর থেকে গলা ভেসে এল। তার একটু বাদে শাশুড়িকে দেখল তিস্তা। সুন্দর শাড়ি পরেছেন। মাথায় যত্ন করে খোঁপা বাঁধা। ভাল আতরের গন্ধ বের হচ্ছে। মুখে পান।

শাশুড়ি বললেন, 'আরও আগে বলা উচিত ছিল। সুমিত কিছু, মানে, বুঝতেই পারছ, ঠিক আছো তো?'

নির্বাক তিস্তা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন মহিলা, 'তোমার এখন ছয়মাস বিশ্রাম প্রয়োজন। ডাক্তার বলেছে এইসময় কোনভাবে শরীরের ব্যবহার চলবে না। জন্ডিস খুব খারাপ রোগ। আমি তোমাকে আমার ঘরেই শুতে বলতে পারতাম কিন্তু তাতে একটু অসুবিধে হবে। অমিত ছেলেমানুষ, তোমার অস্বস্তির কোন কারণ নেই। একি, গালে কি হয়েছে?'

অজান্তেই গালে হাত দিল তিস্তা, 'কই, কিছু না।'

'না বললেই হবে। কালশিরা পড়ে গেছে। সে হতভাগা মেরেছে তোমাকে? জোরজবরদস্তি করেছিল বুঝি। দূর করে দেব এ বাড়ি থেকে।' ভদ্রমহিলা বেশ রেগে গেলেন। তিস্তা বলল, 'আমি যাই।'

'হ্যাঁ, এসো।'

একটা জিনিষ ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে গেল। সুমিত বাড়িতে থাকলে শাশুড়ি তার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেন। কিন্তু সে বাইরে গেলেই কত প্রাণের কথা। বিকেলে কুলপি মালাই আনিয়ে নিজের হাতে খাওয়ানো। তাঁর এক কথা, শরীরটাকে একটু ভারি কর। ভারী শরীর না হলে সন্তান বইবে কি করে। এ বাড়িতে কথাবার্তায় অদ্ভুত একধরনের অশ্লীলতার ফোড়ন সবসময় যেন মিশে থাকে। তিস্তা ভদ্রমহিলাকে বুঝতে পারছিল না। এই গায়ে হাত দিয়ে আদর করছেন আবার সুমিত এলে দাঁত খিচোচ্ছেন। সারাদিনে সুমিতের জন্যে বরাদ্দ পাঁচ টাকা। সেটা দিয়ে বারংবার তিস্তাকে কথা শোনান। তাঁর মতে অমিতের মত ছেলে হয় না।

সুমিত আর অমিত ভাই হলেও স্বভাবে একদম বিপরীত। অমিত অনেক ছটফটে। কথা বলে মনে যা আসে। চেহারায় দুজন দুই মেরুর। অমিত ফর্সা, মায়ের গড়ন পেয়েছে। রাত্রে ওর ঘরে তিস্তার জন্যে আর একটা খাট দেওয়া হয়েছে। নিজের খাটে শুয়ে অমিত বলে, 'দাদা তোমাকে খুব বিরক্ত করে, না বউদি ?'

'কই না তো !'

'বাঃ, তা হলে মা তোমাকে এ ঘরে শুতে বলবে কেন ?'

'কি জানি।'

'তুমি সব জানো, আমাকে বলছ না। বাবা মাকে বিরক্ত করত বলে মঙ্গলামাসীর ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'তাই নাকি ?'

'হুঁ।'

'তুমি একা স্নান করতে পারো না অমিত ?'

'খুব পারি। কিন্তু মঙ্গলা মাসী আমাকে স্নান করিয়ে দেবেই। মঙ্গলামাসী তো মাঝে মাঝে দাদাকেও স্নান করাতো। এখন মা পছন্দ করে না বলে এক আধদিন দেয়।'

তিস্তার ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞাসা করতে সেই স্নানের বৈশিষ্ট্য কি ? কিন্তু তার জিভ প্রশ্নটা উচ্চারণ করতে পারল না।

একমাস পরে আবার কলেজে যেতে পারল তিস্তা। এই তিনমাসে ঘটনা বলতে যা ঘটেছে তা আপাতচোখে তেমন অস্বাভাবিক নয়। তাদের বিয়েকে সামাজিক চেহারা দেবার জন্যে একটা উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রায় সাতশ লোক এসে খেয়ে গেছে। এদের অধিকাংশই সুমিতের আত্মীয়। পুরো খরচটাই তিস্তার বাবার পকেট থেকে হয়েছে। খাট আলমারি থেকে যাবতীয় আসবাব, কাপড়চোপড় তিস্তার বাবা পাঠিয়ে দিয়েছেন এ বাড়িতে।

তিস্তা সুমিতের সঙ্গে কথা বলতে পারে সকালে, দুপুরে, রাত গভীর না হওয়া পর্যন্ত। মাঝে মাঝে সুমিত দুতিনদিনের জন্যে বাইরে যায়। আর ওর মা তিস্তার সঙ্গে দেবীর মত ব্যবহার করেন। এরকম একদিনে ওকে নিয়ে বিশ্বরূপায় থিয়েটার দেখে এসেছেন এক সন্ধ্যায়। ছেলের ওপর মহিলার এত রাগের কারণ তিস্তা এখনও বুঝতে পারেনি।

সুমিতকে তিস্তা কলেজে যাওয়ার কথা বলেছিল। শুনে খেঁকিয়ে উঠেছিল

সুমিত, 'আবার কলেজে যাওয়ার কি দরকার ?'

'আমি পড়তে চাই।'

'খরচা দেবে কে ?'

'মানে ?'

'পড়াশুনায় খরচ নেই ? তোমার বাবা দেবে ?'

'বাবাকে বলব কেন ?'

'তাহলে তোমার শাশুড়িকে বল। তিনি তো তোমাকে দীক্ষা দিয়েছেন।'

সেই দুপুরেই শাশুড়িকে কথাটা বলেছিল তিস্তা। শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন মহিলা, 'কি দরকার ?'

'এভাবে অর্ধেক পড়ে ছেড়ে দিতে চাই না।'

'সুমিতের সঙ্গে যখন উদ্বাস্তুর মত ছিলে তখন কলেজ করতে ?'

'না।'

'তাহলে ? মেয়েছেলে বেশী পড়লে মাথা নষ্ট হয়ে যায়। তোমার যদি সেটা করতে ইচ্ছে করে করো তবে আমি একটা পয়সাও দিতে পারব না।'

'আমি যদি রোজগার করি তাহলে আপত্তি করবেন ?'

তুমি আবার কি ভাবে রোজগার করবে ?'

'এ বাড়িতে আমি প্রথম দিন যে জন্যে এসেছিলাম তাই করে।'

'অ। বেশ দ্যাখো চেষ্টা করে।'

ভদ্রমহিলা যাই হোন না কেন, এই অনুমতিটুকু দেবার জন্যে তিস্তা ওঁর কাছে সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে। কলেজের মাইনে বাকি পড়ে গিয়েছিল, পার্সেন্টেজ নিয়েও সমস্যা হবে। তবু জয়ন্তীর চেষ্টায় লছমির সঙ্গে কথা বলতে পারল তিস্তা। বিয়ের পর এই কয়েকমাসে তার চেহারার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। কলেজের ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে তাকে দ্যাখে। তিস্তা প্রতিজ্ঞা করল যেমন করেই হোক তাকে ভাল রেজাল্ট করতে হবে।

লছমির কাকা থাকেন থিয়েটার রোডে। বিরাট ব্যবসায়ী। ওঁর দুই মেয়ের বয়স দশ আর আট। দুজনেই ক্যালকাটা গার্লসে পড়ে। লছমির কাকিমা খুব নরম প্রকৃতির মানুষ। কাকার নাম শাওনরাম আগরওয়ালা। বছর পঁয়তাল্লিশের মানুষ। বললেন, 'লছমি যখন আপনাকে রেফার করছে তখন আমার কোন আপত্তি নেই। তিনজনকে পড়াতে আপনাকে কত দিতে হবে ?'

'তিনজন ?'

'দুই মেয়ে আর ওদের মা। মাকে ইংরেজি বলতে শেখাতে হবে।'

'আপনি যা ভাল বুঝবেন।'

'আপনি ম্যারেড ?'

'হ্যাঁ।'

'মাসে সাতশ দেব। যদি মেয়েরা অ্যাভাব্ সিক্সটি পার্সেন্ট পায় তাহলে মাথা পিছু পঞ্চাশ করে ইনক্রিমেন্ট। চলবে ?'

'তিস্তার মনে হয়েছিল অঙ্কটা আশাতিরিক্ত।

সকালে পড়াশুনা, দশটায় কলেজ করে চারটের মধ্যে থিয়েটার রোডে যায় তিস্তা সপ্তাহে চারদিন। তিনদিন মেয়েদের জন্যে একদিন ওদের মায়ের

প্রয়োজনে। সেখান থেকে সাড়ে ছটায় বেরিয়ে বাড়ি পৌঁছাতে সাতটা পার হয়ে যায়। মিসেস আগরওয়ালা ওইসময় একা ছাড়েন না। ওদের গাড়ি তাকে ধর্মতলা নিয়ে এসে ট্রাম ধরিয়ে দেয়। মাড়োয়ারি বাড়ির রান্না মন্দ লাগে না ওর। একটু ঘনিষ্ঠতা বাড়তে ভদ্রমহিলার অনেক কষ্টের কথা জেনে ফেলল তিস্তা।

এই এত বড় ফ্ল্যাট, এত টাকা পয়সা, ঘরে ঘরে টিভি, একাধিক গাড়ি সত্ত্বেও ভদ্রমহিলা স্বামীর মন জয় করতে পারেননি। শাওনরামজী কর্তব্য করতে ভুল করেন না কিন্তু বাইরের জীবনে স্ত্রীকে কিছুতেই নিয়ে যাবেন না। তাঁর স্ত্রী নাকি অভিজাত সম্প্রদায়ের সামনে কথা বলার উপযুক্ত নয়। স্ত্রীর সঙ্গে ওর কোন ঝগড়াঝাঁটি নেই। কিন্তু বাইরে ভদ্রলোকের প্রচুর বান্ধবী আছে। তাঁরা এক একজন ডানাকাটা আধুনিকা। শাওনরামজীর মোটা খরচ হয় তাঁদের পেছনে। একদিন ওঁর ব্যাগে মেয়েরা সেসব মহিলার ছবি দেখেছিল। শাওনরামজী ঠাট্টা করে মেয়েদের ছবিগুলো দেখিয়ে বলেছেন, 'এদের মধ্যে যে কেউ তোমাদের মা হতে পারত।'

এসব কথা শুনে শাওনরামজী সম্পর্কে যে ধারণা তৈরী হয়েছিল তা তাঁর ব্যবহারে দেখতে পায়নি তিস্তা। বস্তুত ভদ্রলোকের সঙ্গে তার দেখা হয় কদাচিৎ। দেখা হলেই বাঁধা ধরা কয়েকটা প্রশ্ন, 'স্ত্রীর শরীর ভাল আছে? মেয়েরা কেমন পড়ছে? ওদের মায়ের প্রগ্রেশ হচ্ছে কেমন?' ব্যাস। তিস্তা সম্পর্কে একটুও আগ্রহ দেখাননি ভদ্রলোক। অথচ ওরকম চরিত্রের মানুষের সম্পর্কে সেটাই ভাবা যেতে পারে।

সুমিতকে দূরে সরিয়ে রাখা তিস্তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এক সকালে ওর ঘরে যেতে পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা বিয়ে করেছিলাম কেন?'

বুঝতে পারেনি তিস্তা, 'মানে?'

'তোমাকে চুমু খেতে চেয়েছিলাম। রাজী হওনি। বলেছিলে বিয়ের আগে ওসব চলবে না। তাই বিয়ে করেছিলাম।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'কিন্তু বিয়ে করে কি লাভ হল?'

'আশ্চর্য। তোমার মাকে জিজ্ঞাসা কর।'

'তুমি কাকে মান্য করবে? আমাকে না মাকে?'

'এ বাড়ির সব তো তোমার মা।'

'বাজে কথা বলবে না। হাসপাতাল থেকে ফিরে শরীরের দোহাই দিয়েছিলে। জন্ডিস তো সেরে গেছে অনেকদিন। থিয়েটার রোডে টিউশুনি করতে যেতে পারছ। আর কতদিন আমাকে উপোসী রাখবে?'

'একটু ভদ্রভাবে কথা বল।'

'না। আর বলা সম্ভব নয়।' সুমিত পাশ কাটিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করল। তারপর একটুও ভূমিকা না করে তিস্তাকে জড়িয়ে ধরল। তিস্তা বাধা দিল না। বাধা দেবার কথা তার মাথায় এলোও না। সে পুতুলের মত সুমিতের ইচ্ছের কাছে নিজেকে সমর্পণ করল। ক্ষুধার্ত কুকুর যেমন গোগ্রাসে এঁটোকাঁটা খেয়ে নেয় তেমনি সুমিতের আচরণ ছিল। একসময় সে শান্ত হতে

তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'আর কিছু বলার আছে ?'

'না। দরজা খুলে দাও।'

'ওটা তুমি বন্ধ করেছ, তুমিই খুলবে।'

'মানে ?'

'আমি যা বলেছি তা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়।'

'তোমার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে আমি তোমাকে রেপ করলাম।'

জবাব দিল না তিস্তা। সুমিত কয়েক মুহূর্ত অস্বস্তিতে থেকে উঠে দরজা খুলল। তিস্তা আর দাঁড়াল না। নিজের ঘরে পৌঁছানো না পর্যন্ত সে কাঁদতেও পারছিল না। প্রথম মাসের মাইনে শাওনরামজী নিজের হাতে দেননি। স্ত্রীকে খামটা দিয়ে গিয়েছিলেন। মিসেস আগরওয়ালা সেটা দিতে তিস্তা লক্ষ্য করেছিল খামের মুখ বন্ধ। আচমকা একটা সন্দেহ হল। খাম বন্ধ করে টাকা দেবার উদ্দেশ্য কি ? টাকার সঙ্গে অন্যকোন প্রস্তাব আছে নাকি ?

মিসেস আগরওয়ালার সামনেই খামটা ছিঁড়েছিল তিস্তা। ভেতর থেকে টাকা বের হল। শুধুই টাকা। আর নিজের সন্দেহের জন্যে লজ্জিত হল সে। তার মনে হল আগে হলে সে সন্দেহ করার কথা ভাবতই না। এই কয়েকমাস তার মনের গঠন একদম পাল্টে দিয়েছে।

সুমিতকে সে ভালবেসে বিয়ে করেছিল। এখন সেই ভালবাসা কতটুকু বেঁচে আছে ? সেই টান অথবা উন্মাদনা। যে ভালবাসা মাটিতে কাগজ পেতে শোওয়ার কষ্টকে উপেক্ষা করার শক্তি যোগায় সেটা কোথায় উধাও হয়ে গেল এই কয় মাসে। সুমিতকে এখন অপরিণতমনস্ক মানুষ ছাড়া কিছুই মনে হয় না। ওর বাড়িতে থাকতে হবে তাকে। বাবা মায়ের জন্যে থাকতে হবে। হাসপাতালে বাবা যে প্রশ্নটা তাকে করেছিলেন তার জবাব নইলে এখনই দিয়ে দেওয়া হবে।

মাইনের টাকার নিজের প্রয়োজনীয় খরচটুকু বাদ দিয়ে সবার জন্যে কিছু না কিছু উপহার কিনে ফেলল তিস্তা। শাশুড়ির জন্যে শাড়ি, শ্বশুরের ধুতি, সুমিতের টি সার্ট, অমিতের জন্যে কলম আর, হ্যাঁ, মঙ্গলার জন্যে একটা শাড়ি। মঙ্গলার জন্যে কেন কিনেছিল তার ব্যাখ্যা অনেক পরেও মনে আসেনি। এখন মঙ্গলার সঙ্গে তার কথা হয় খুবই কম।

বাড়িতে ফিরতে রাত হয়ে গেল আজ। ওপরে উঠতেই শাশুড়ি সামনে এসে দাঁড়ালো, 'কি ভেবেছ ? পড়াশুনার অনুমতি দিয়েছি বলে কি মাঝরাত্রে বাড়ি ফিরবে ? এরকম হলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'দোকানে গিয়েছিলাম বলে দেরি হয়ে গেল।'

'দোকানে আবার কি করতে গিয়েছিলে ?'

'আজ মাইনে পেয়েছি। তাই-।' ব্যাগ থেকে শাড়ির প্যাকেটটা বের করে তিস্তা সামনে ধরল, 'এটা আপনি পরবেন।'

'কি এটা ?' প্যাকেট খুলে ভদ্রমহিলা অবাক চোখে তাকালেন। হঠাৎ তাঁর চোখ চকচক করে উঠল। জড়ানো গলায় বললেন, 'তুই বড় বোকা মেয়ে।'

টি সার্টটাকে চোখের কোণে দেখল সুমিত। তারপর বলল, 'কাল মাইনে

পেয়েছ ?'

'হ্যা।'

'কত ?'

'সাড়ে সাতশ।'

'বাপস। তুমি তো দেখছি বড়লোক।'

'ঠাট্টা করো না।'

'মাইনে পেয়েই এত খরচ করার কোন দরকার ছিল না।'

'সেটা আমি বুঝব।'

সুমিত উঠল। তারপর বলল, 'তুমি আজকাল সবসময় আমার ওপর রেগে থাকো। আমাকে তোমার খুব খারাপ লাগছে ?'

জবাব না দিয়ে ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল তিস্তা, সুমিত ডাকল, 'তিস্তা।'

দরজায় পৌঁছেছিল তিস্তা, সেখান থেকেই জবাব দিল, 'বল।'

'একটা কাজের খবর পেয়েছি। আমার এক বন্ধু বিহারের জমিদার পরিবারের ছেলে। এর আগেও কয়েকবার গিয়েছি আমি। ওদের একটা ব্যবসা দেখাশোনা করতে হবে। প্রব্লেম হল আমার পকেট একদম খালি। যাব কি করে ? দাও তো শ'দুয়েক, মাইনে পেলে শোধ করে দেব।'

'আমার কাছে টাকা নেই।'

'মাইরি আর কি ! কাল সাড়ে সাতশ পেলে আর আজ বলছ নেই। ঢপ।'

'যা সত্যি তাই বললাম।'

'আশ্চর্য ! তুমি চাওনা আমি রোজগার করি ?'

নিশ্চয়ই চাই।'

'একটা সার্ট কিনতে সাড়ে সাতশো নিশ্চয়ই শেষ করোনি ?'

'কলেজের মাইনে বাকি ছিল। তাছাড়া সবাইকে দিতে গেলে আর কি থাকে।'

'সবাইকে মানে ? মা বাবাকে দিয়েছ নাকি ? কি দরকার ছিল ! যাচ্চলে, আমি ভাবলাম আমাকেই তুমি স্পেশ্যাল অনার দিলে। কলেজের মাইনে দেবার স্কোপ তো এখন পর্যন্ত পাওনি। আজ দিতে হবেনা। সামনের মাসে দিলেই হবে।'

'তোমার মায়ের কাছে চাওনা।'

'মুখ দেখতে চায় না, পাঁচটাকাই বরাদ্দ।'

'এমন ছেলে তুমি যে নিজের মা মুখ দেখতে চায় না।'

'যা জানো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। আমি যদি ওই উকিলের ছেলে না হতাম তাহলে মা কি এই ব্যবহার করত ?'

'উকিলের ছেলে না হতে মানে ?'

'বললাম তো, বুঝবে না। বুঝতে চেও না। তবে আমিও ছেড়ে দেবার পাত্র নই। সাপের বিষেই সাপ মারবো। শুধু ওয়েট করছি, সময় এলেই দেখতে পাবে। যাক গে, মালটা এনে দাও।'

'আমার পক্ষে তোমাকে এক পয়সা দেওয়া সম্ভব নয়।' তিস্তা হনহন করে বারান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগল। এইসময় মঙ্গলা আসছিল। তাকে দেখতে পেয়ে

চাপা গলায় ডাকল, 'বউমা।'

তিস্তা তাকাল। মঙ্গলা বলল, 'তুমি আমার জন্যে অত দামী শাড়ি কিনে আনলে ? আমি ভাবতেই পারছি না। এ বাড়ির গিন্নীর হাত এত ওপরে আজ পর্যন্ত ওঠেনি, উঠবে না। আমি পাপী তাপী মানুষ, আমার জন্যে—।'

'নিজেকে পাপী বলছ কেন ?'

'পাপ করছি তো পাপী বলব না। দুটো পয়সার লোভে একটার পর একটা পাপ করে যাচ্ছি। তোমার মন দেবীর মত।'

'মা কোথায় ?'

'তাঁর ঘরে।'

তিস্তা আর দাঁড়াল না। শাশুড়ি নিজের ঘরের মেঝেয় বসে পান সেজে চলেছেন একটার পর একটা। নিজে না সাজলে পান মুখে দিতে পারেন না। মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল ?'

তিস্তা মাথা নিচু করল। তারপর বলল, 'আপনার ছেলে বলছে বিহারে গেলে একটা চাকরি পেতে পারে। ব্যবসা দেখাশোনা করতে হবে।'

'কার ব্যবসা ?'

'আমি জানি না।'

'তা কি করতে হবে ?'

'যাওয়া আসা এবং পথখরচার জন্যে আমার কাছে টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তো জানতাম না, সব খরচ হয়ে গেছে।'

'এক পয়সাও দেবে না।' হুঙ্কার দিলেন শাশুড়ি।

তিস্তা অবাক হয়ে তাকাল। শাশুড়ি বললেন, 'বিহারে যাবে চাকরি করতে। ছাই চাকরি। ওর ওই জমিদারের বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্য অন্য। সেসব তোমাকে জানতে হবে না। ওকে বলো, আমার কাছে এসে টাকা চাইতে।'

'বলেছিলাম। আমায় চাইতে বলল।'

'না। তুমি চাইবে না। বিনিপয়সায় বড়লোকের বউ-এর সঙ্গে ফুর্তি করতে যাবে আর আমি পথ খরচা দেব ?'

তিস্তা নীল হয়ে গেল। সুমিত রোজগার করে না। পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে। ওর কথাবার্তায় অশালীন শব্দ আসছে। তাকে মেরেওছে। এসব ঠিক। কিন্তু অন্য কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে ও জড়িত এটা ভাবতে পারছিল না তিস্তা। চোরের মত সে সরে এল শাশুড়ির সামনে থেকে।

দুপুরে প্রচণ্ড মাথা ধরেছিল। সকালে কলেজে আসার সময় খেতে পারেনি। কথাটা শোনার পর থেকেই শরীর গোলাচ্ছিল। সম্ভবত খালি পেট বলেই কলেজের টয়লেটে গিয়ে বমি করে ফেলল সে।

সেদিন আর থিয়েটার রোডে পড়াতে গেল না সে। ইউনিভার্সিটির টেলিফোন বুথ থেকে মিসেস আগরওয়ালাকে টেলিফোনে বলে দিল শরীর খারাপ। বাড়ি ফিরে গিয়ে সে চুপচাপ শুয়ে রইল। অবেলায় তাকে ফিরতে দেখে অমিত জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ?' তিস্তা চোখের ওপর হাতের আড়াল রেখে বলেছিল, 'শরীর খারাপ লাগছে।' শোনামাত্র অমিত ছুটল মায়ের

কাছে।

মিনিট দশেক বাদে মঙ্গলা এসে হাজির। ঘরের আলো জ্বেলে সে পাশে বসে মাথায় হাত দিল, 'না তো। জ্বর নেই। গিন্নীমা বলল তোমার নাকি শরীর খারাপ।'

তাড়াতাড়ি উঠে বসল তিস্তা, 'এমন কিছু নয়।'

'কি হয়েছে ?'

'গা গুলোচ্ছিল।'

'কখন ?'

'কলেজে। মাথা ধরেছিল।'

'বমি করেছ ?'

'হ্যাঁ। তারপর থেকে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। একটু বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে। মাকে চিন্তা করতে মানা করো।'

'সাধে কি চিন্তা করছে। তার কারণ আছে।'

'কি কারণ ?'

'এ মাসে আতর তোমার কলঘরে সেসব কিছু পায়নি।' রহস্যময় হাসি হাসল মঙ্গলা, 'গিন্নীমার চিন্তার কারণ তো সেটাই।'

তিস্তা ঠোঁট কামড়ালো। ব্যাপারটা তাকেও চিন্তান্বিত রেখেছিল। কিন্তু এ বাড়ির মানুষজন তার ওপর এমন নজর রেখেছে !

মঙ্গলা বলল, 'আমি এক গ্লাস দুধ এনে দিচ্ছি। খাও তো !'

'আমি দুধ খেতে যাব কেন ?'

'আহা ! শরীরে বল পাবে।' মঙ্গলা আঁচল থেকে একটা পুরিয়া বের করল, 'তার আগে এটা খেয়ে নাও।'

'কি এটা ?'

'হোমিওপ্যাথি ওষুধ। পালসিটিলা। তোমার কপাল যদি না পোড়ে তাহলে সাতদিনের মধ্যে আতরের কাছে খবর পেয়ে যাব। হাঁ করো।'

'খামোকা ওষুধ খেতে যাব কেন ?'

'দ্যাখো বউমা, আমি তোমার ভাল চাই। এই ওষুধ তোমার কোন ক্ষতি করবে না। তুমি আমার কথা শুনলে লাভ বই ক্ষতি হবে না। হাঁ করো।'

প্রায় মন্ত্রপূতের মত তিস্তা হাঁ করল। মঙ্গলা তার মুখে একটা কাগজের ভাঁজ খুলে খানিকটা সাদা গুঁড়ো ঢেলে দিল। দিয়ে বলল, 'ভগবানকে মন দিয়ে ডাকো, যেন এতে কাজ হয়।'

শরীরে বমি বমি ভাবটা কিছুতেই যাচ্ছিল না। অথচ শারীরিক স্বস্তি আসছিল না কিছুতেই। তিস্তা কলেজ করছে, টিউশুনিতে যাচ্ছে কিন্তু সারাক্ষণ ওই একই চিন্তা তাকে কুরে খাচ্ছিল। আজকাল রোজ একবার করে বমি হচ্ছেই। খাওয়াদাওয়ায় অরুচি এসে গেছে। ভগবানকে আপ্রাণ ডেকে যাচ্ছিল সে।

সাতদিন পার হয়ে গেলে এক সকালে শাশুড়ি ওর ঘরে এলেন। অমিত তখন তার পড়ার টেবিলে। শাশুড়ির ধমকে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবার শাশুড়ি তার দিকে তাকালেন, 'শেষ পর্যন্ত বাধালে ?'

কথাটার মানে প্রথমে ধরতে পারেনি তিস্তা।

'তোমাদের আলাদা করে দিলাম, ওই হতভাগা যাতে তোমাকে নষ্ট না করতে পারে তার ব্যবস্থা করলাম অথচ সেসব বৃথা হল ' শাশুড়ি গম্ভীর গলায় বললেন, 'কথাগুলোর জবাব দাও।'

'আমি কিছু জানি না।' তিস্তা বলল।

'জানি না বললে হবে ? আকাশ থেকে দেবতা নেমে তো তোমার পেটে বাচ্চা দিয়ে যায়নি !' শাশুড়ির গলা শনশনে।

প্রচণ্ড কেঁপে উঠল তিস্তা। তার পেটে বাচ্চা ? তার পেটে ?

'পালসিটিলা হাজার খেয়েও যখন হোল না তখন তো সন্দেহ বলে আর কিছু রইল না। তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ।'

'আমি ?'

'হ্যাঁ। তোমাকে আমি বলেছিলাম ওকে প্রশ্রয় না দিতে, তুমি শোননি। শরীরের মজা পাওয়ার জন্যে আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও ওর কাছে গিয়েছ।'

হঠাৎ মাথায় বিদ্যুৎ বয়ে গেল যেন। তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আপনার নিজের ছেলে সম্পর্কে এমন কথা বলছেন কি করে ?'

'তার জবাবদিহি তোমাকে দেব না। আমি তোমাকে বলেছিলাম এ বাড়িতে থাকতে হলে আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে। বলিনি ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি শোননি। কি শাস্তি চাও তুমি ?'

'শাস্তি ?'

'হ্যাঁ। হয় তোমাকে এ বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে নয় ওই পাপ দূর করতে হবে।'

'কি বলছেন আপনি ?'

'ঠিকই বলছি। উকিলের রক্ত এ বংশের উত্তরাধিকারের শরীরে থাকুক আমি চাই না। জীবিত অবস্থায় চাইব না ' শাশুড়ি উঠলেন, 'আজকের রাতটা সময় দিলাম। যা করবে কাল আমাকে জানিও।'

শাশুড়ি চলে যাওয়া মাত্র হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল তিস্তা। সে কি করবে ? এ বাড়ি থেকে চলে যাওয়া এখন কি সম্ভব ? চলে গেলে যে এখানে আর কখনও ঢুকতে পারবে না তা জলের মত পরিষ্কার। সুমিতকে সে আর হয়তো আগের মত ভালবাসে না কিন্তু তার শরীরে যদি সন্তান এসে থাকে তাহলে সেটা তো তারই সন্তান। তার ইচ্ছে করছিল এখনই বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। শ্যামনগরে বাড়ি হচ্ছে। বাবা-মা, সেখানেই বাসাভাড়া করে আছেন। সামনের মাসে গৃহপ্রবেশ। কিন্তু এখন যদি সে ওদের কাছে যায় তাহলে সত্যি কথা বলতে হবে। তাহলে বাবার প্রশ্নের জবাবটা দেওয়ার দরকার হবে না। কিন্তু সেটা তার উত্তর নয়। কিছুতেই নয়।

রাত বাড়ল। সুমিত নিশ্চয়ই এতক্ষণ ফিরে এসেছে। তার মনে হল একমাত্র সুমিতই তাকে এ অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু আজ রাত্রে সুমিতের কাছে যেতে তার সঙ্কোচ হচ্ছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল শাশুড়ি একজন মেয়ে। ওঁর কাছে নিজেকে মেলে ধরলে নিশ্চয়ই সাহায্য পাবে।

ভদ্রমহিলা তাকে মেয়ে বলেছেন। ওঁর বুকের ভেতর যে একটা নরম মন আছে তার প্রমাণ সে পেয়েছে অনেকবার। তিস্তার বুকে একটু একটু করে ভরসা ফিরে আসছিল। কিন্তু সে ভুল করেছিল।

সকালবেলায় জড়ানো পায়ে সে যখন শাশুড়ির ঘরে গেল তখন মঙ্গলা সেখানে কথা বলছে। দরজার বাইরে পৌঁছাতেই তার পা আড়ষ্ট হল। ঘরের ভেতর শাশুড়ি বলছেন, 'তোর এত ঠাট ধমক চমক আর এখন এমন ভাব করছিস যে কিছুই জানিস না। শেকড় বাকড় কি আছে নিয়ে আয় চটপট।'

মঙ্গলা বলল, 'এটা ঠিক হবে না গিন্নীমা।'

'কেন?'

'একদম প্রথম দিকে। হিতে বিপরীত হোক আর কি!'

'তার মানে?'

'পেটেরটাকে মারতে গিয়ে যে পেটে ধরেছে তার ক্ষতি হতে পারে। তার চেয়ে বলি সত্যি যদি যা বলছ তাই চাও তাহলে কোন নার্সিংহোমে নিয়ে যাও, ডাক্তার দেখাও। একবেলায় হয়ে যাবে।'

'খুব বক্তৃতা দিচ্ছিস। নার্সিংহোমে কত খরচ জানিস?'

'তা না হয় হলো।'

'আহা, ন্যাকা!'

'এ ছাড়া কোন রাস্তা নেই।'

'তুই তাহলে ওষুধ দিবি না?'

'ওষুধ দিতে পারি কিন্তু থানা পুলিশ তুমি করবে।'

'থানা পুলিশ কেন?'

'মরলে তোমার বেয়াই ছেড়ে দেবে? তার ওপর ঘরেই তোমার শত্রু আছে। একটু খরচা হলেও নার্সিংহোমই ভাল। আর ও যদি বাপের বাড়ি চলে যায় তাহলে সোনায় সোহাগা।'

'মঙ্গলা, তোর বুদ্ধি দিন দিন ঢেঁকি হচ্ছে। বাপের বাড়িতে গিয়ে ও যখন বিয়োবে তখন উকিলের নাতিনাতনি জন্মাবে। ঠিক আছে, আজ তোদের মামা এলে বলব নার্সিংহোমের ব্যবস্থা করতে। যাবে কিছু টাকা!'

শাশুড়ির কথা শেষ হওয়ামাত্র তিস্তা ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ফিরে এল। ওর সমস্ত শরীর কাঁপছিল। বিছানায় বসে নিজের পেটে হাত দিল সে। অসম্ভব। একে সে মেরে ফেলতে দেবে না।

দিনটা কেটে গেল অলসভাবে। রাত এল। শাশুড়ি বা মঙ্গলা কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে এল না। অমিত খাওয়াদাওয়া শেষ করে ঘরে ঢুকে বলল, 'বউদি, মা তোমাকে বলতে বলল দাদার ঘরে গিয়ে শুতে।'

বিশ্বাস করতে পারছিল না তিস্তা। শাশুড়ি আজ এই অবস্থায় হঠাৎ উদার হয়ে গেলেন কেন? তার পরেই খেয়াল হল। তিস্তা আর তাঁর স্নেহের ছায়ায় নেই জানার পর তিনি তাকে শত্রু ভাবে দেখার জন্যেই মুক্তি দিতে চাইছেন। সুমিতের ঘরে গিয়ে শোওয়ার অনুমতিতে বিন্দুমাত্র উৎফুল্ল হত না তিস্তা কিন্তু আজ হল।

সুমিত নিজের বিছানায় শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে

অবাক হল, 'কি ব্যাপার ? এই সময়ে ?'

তিস্তা কথা না বলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টুকটাক কাজ সারতে লাগল।

'মতলবখানা কি বলতো ? তুমি এ-ঘরে শোবে নাকি ?' পাশ ফিরল সুমিত।

'তোমার মা অমিতকে দিয়ে তাই বলে পাঠিয়েছেন।' মুখ না ঘুরিয়েই বলল তিস্তা।

'আই বাপ ! এ যে মেঘ না চাইতেই জল।' উঠে বসল সুমিত, 'উঁহু। ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না। ডালমে কালা হ্যায়।'

'তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে এসো।'

'জানার সোর্স আমার আছে। এখনই জেনে আসছি। তুমি বুঝতে পারছ না, আমার মাতৃদেবীর হৃদয় হঠাৎ প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে যেতে পারে না। বিরাট ঝড়বৃষ্টি আসছে। মনে হচ্ছে কেলো তুমিই করেছ। তাহলে আমাকে জড়ানো কেন। আসছি।' সুমিত বিছানা থেকে নেমে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মায়ের কাছে নিশ্চয়ই যাবে না। জিজ্ঞাসা করবে কাকে ? এক পলক দরজার দিকে তাকিয়ে মেঝেতে চাদর আর বালিশ পেতে শুয়ে পড়ল তিস্তা। মিনিট তিনেক বাদে সুমিত ফিরে এল। চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল তিস্তা। পায়ের আওয়াজ পেয়ে বলল, 'আলোটা নিভিয়ে দাও, প্লিজ।'

'আমায় বলনি কেন ?' সুমিত চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'কি বলব ?'

'তোমার পেটে বাচ্চা এসেছে !'

'কথাটা ভদ্রভাবে বলতে পারছ না।'

'আর ভদ্রভাবে। চাকরি নেই, তোমার সাড়ে সাতশ' টাকায় বাচ্চা মানুষ করতে পারবে ? একটুও তর সইল না। অদ্ভুত মেয়েছেলে মাইরি তুমি।'

সুমিত পাশে এসে দাঁড়াল। তিস্তা ওর দিকে তাকাল মেঝেতে শুয়েই। কি লম্বা দেখাচ্ছে সুমিতকে। এখন যদি ও একটা লাথি মারে—। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল তিস্তা। তারপর বলল, 'সেদিন সকালের ব্যাপারটার জন্যে দায়ী কে ? আমি ?'

'নিজেকে ঠিক রাখতে পারোনি। শালা, আমার প্রথম সন্তান, ওঃ, অদ্ভুত।' সত্যি সত্যি ককিয়ে উঠছিল সুমিত। অন্তত সেই আচরণে কোন অভিনয় নেই বলে মনে হচ্ছিল তিস্তার। সে তাড়াতাড়ি উঠে সুমিতের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, 'সুমিত !'

'কি ?' স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে।

'তোমার মা—।' আচমকা কেঁদে ফেলেছিল তিস্তা।

'কি বলেছে তোমাকে ?'

'দুটো রাস্তার একটা বেছে নিতে বলেছেন। হয় এ বাড়ি ছেড়ে চিরকালের মত চলে যেতে হবে নয় আমার পেটে যে এসেছে তাকে—।' ডুকরে উঠল তিস্তা।

তাকে ভীষণ অবাক করে সুমিত বলল, 'এতে কান্নাকাটির কি আছে ?'

অবাক হওয়া তিস্তা হঠাৎ যেন আলোর দেখা পেল, দুহাতে সুমিতকে আঁকড়ে বলে উঠল সে, 'আমি পারব সুমিত। তুমি পাশে থাকলে নিশ্চয়ই পারব। আমি আরও টিউশুনি করব। তুমি যদি কিছু রোজগার করো তাহলে—।'

'হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনের বাড়িটায় আবার যেতে পারি। তাই?'

'হ্যাঁ। তুমি কালই যাও। যদি খালি থাকে এখনও—।'

'পাগল।'

বুঝতে পারল না তিস্তা, 'মানে?'

'আমাকে পাগলা মশা কামড়ায়নি। সুখে থাকতে ভূতের কিল সহ্য করতে যাব কেন? ওখানে গিয়ে অনেক শিক্ষা হয়েছে। ন্যাড়া আর বেলতলায় যাবে না।'

'মানে?' দ্বিতীয়বার শব্দটা ঠোঁট থেকে বের হল।

'ওই রকম ভিখিরীর মত থাকতে পারব না আমি।'

'ভিখিরী।' কেঁপে উঠল তিস্তা।

'অফকোর্স। কিনা প্রেমের জন্যে লক্ষ মাইল হাঁটতে পারি। হেঁটে দ্যাখো না। আমি দেখেছি। ফাঁপা রোমান্টিসিজম আমার ধাতে নেই। একটা পুরোনো বাংলা ছবি দেখেছিলাম। তাতে চমৎকার ডায়ালগ ছিল। অভাব যখন দরজা দিয়ে ঢোকে তখন ভালবাসা জানলা গলে পালিয়ে যায়।'

'তাহলে?'

'তাহলে আবার কি! মা যা চাইছে তাই হবে। তাতে মাথার ওপর ভাল ছাদ থাকবে। পেটে খাবার জুটবে দুবেলা, পরীক্ষা দিতে পারবে। তিস্তা, তোমার ওই সস্তা রোমান্টিসিজম ছেড়ে একটু প্র্যাকটিকাল হও।'

'একটু আগে তুমি, তুমি তোমার প্রথম সন্তান—।' গলা বন্ধ হয়ে গেল তিস্তার।

'শোনামাত্র একটু সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছিলাম। এখন পরিষ্কার হয়ে গেছি।'

'না। অসম্ভব।' তিস্তা জোরে বলল।

'কি?' ঘুরে দাঁড়াল সুমিত।

'আমার শরীরে যে এসেছে সে থাকবে।'

'অ। তাহলে কাল সকালেই তোমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। একা।'

'সুমিত।'

'আমি তোমাকে আবার স্পষ্ট বলছি তিস্তা এই সেন্টিমেন্টের কোন মূল্য নেই। মা এরই মধ্যে তোমার জন্য নার্সিংহোমের ব্যবস্থা করে ফেলেছে।'

'এরই মধ্যে?'

'হ্যাঁ। মায়ের ডান হাত খুব অ্যাকটিভ।'

হাউহাউ করে কেঁদে উঠল তিস্তা। সুমিতকে জড়িয়ে ধরে অনেক মিনতি করতে লাগল। সুমিত কিছুক্ষণ পরে বলল, 'যাকে চোখে দ্যাখোনি, অনুভব করতে পারছ না, যার কোন শেপ আসেনি তাকে রাখার জন্যে এমন হ্যাংলাপনা

করছ কেন ?'

'এ আমার প্রথম সন্তান।'

'তাই ? কিভাবে এসেছে ? তোমাকে তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে সেদিন সকালে রেপ করেছিলাম বলেই তো। এমন কি দরজাটাও আমাকে খুলতে বাধ্য করেছিলে তুমি। মনে পড়ে ! তাহলে তোমার কাছে যেটা অন্যায় ছিল, ঘৃণ্য কাজ ছিল, তার ফসলের জন্যে এমন হামলে পড়ছ কেন ? অদ্ভুত মাইরি।'

'আমি অ্যাবরশন করাব না।'

'ঠিক আছে। বেরিয়ে যাও। কেউ তো আটকাচ্ছে না।'

'বেরিয়ে কোথায় যাব ?'

'কেন ? তোমার বাপ মায়ের কাছে !'

'অসম্ভব। আমি তাহলে হেরে যাব। সুমিত, প্লিজ, তুমি আমাকে একটু বোঝ। সুমিত—।' তিস্তা জড়িয়ে ধরেছিল সুমিতকে।

'আঃ, ছাড়ো বলছি।'

'না। আমি তোমাকে ছাড়ব না। কাল সকালে তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

'যেতে হবে ?'

'হ্যাঁ। আমরা ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম।

'ভুল করেছিলাম। শালা একটা চুমুর জন্যে বিয়ে।' হঠাৎ টেবিলে রাখা নিজের বেল্টটা তুলে নিল সুমিত, 'আর একবার ফালতু কথা বললে—'।

'তুমি আমাকে মারবে ?' বিশ্বাস করতে পারছিল না তিস্তা।

'ইয়েস। তোমার পাল্লায় পড়ে আমি আর বোকামি করতে চাই না।'

'পাল্লায়। কে কার পাল্লায় পড়েছে ? আমার পেছনে ঘুরেছিল কে ? তুমি মানুষ ? ছিঃ। তোমার চেয়ে একটা জন্তুও অনেক বেশী বিশ্বাসভাজন।' রাগে ঘেন্নায় কথাগুলো তিস্তার মুখ থেকে ছিটকে ওঠা মাত্র সুমিতের হাত চলল। চতুর্থবার আঘাত লাগামাত্র দরজায় মঙ্গলার গলা শোনা গেল, 'কি হচ্ছে সুমিত ?'

'ঠিকই হচ্ছে।' সুমিত মঙ্গলার দিকে তাকাল।

'না। ঠিক হচ্ছে না। এ বাড়িতে বউমা এসেছে গিন্নীমায়ের ইচ্ছেয়। তোমার ইচ্ছেতে নয়। অতএব ওর গায়ে তুমি হাত তুলতে পারো না। এসো বউমা, তুমি তোমার ঘরে শোবে চল।' মঙ্গলা এগিয়ে এসে তিস্তার হাত ধরল।

তিস্তা কাঁদছিল না। সে পাথরের মত সুমিতকে দেখছিল। বেল্ট হাতে সুমিত এখন বিছানায় গিয়ে বসেছে। এই লোকটা তার স্বামী ! একেই ভালবেসে সে বিয়ে করেছিল। বাবা তাকে এমন লোককে বিয়ে করার শিক্ষা দিয়েছিলেন ! মানুষ যখন ভালবাসে তখন ঈশ্বর তাকে ভবিষ্যৎ দেখতে দেন না কেন ? এ কেমন জুয়াখেলা !

অমিতের ঘরে নিয়ে যাওয়ার সময় লম্বা করিডোরের প্রান্তে পৌঁছে মঙ্গলা দাঁড়াল, 'বউমা। আমি অশিক্ষিত মানুষ। গতর ছাড়া কিছু নেই। তবু আমার কথা শোন। জীবনে তো অনেক দেখেছি। গিন্নীমা যা চাইছে তা কর।'

চোখ বন্ধ, দাঁতে দাঁত, দ্রুত মাথা নেড়ে না বলল তিস্তা।

'আমি জানি তোমার কষ্ট হবে। কিন্তু সারাজীবনের কষ্টের চেয়ে এখনকার কষ্ট কি খুব বেশী দামী ? কিছুতেই না। যে লোকটা তোমার গায়ে হাত তুলল, পথে নামিয়ে যে সরে দাঁড়ায় তার সন্তান তুমি শরীরে রাখতে চাইছ ? যাকে একটু একটু করে বড় করবে সে যে বড় হয়ে বাবার চেয়েও সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতক হবে না তা কে বলতে পারে !'

'না !'

'হ্যাঁ। পুরুষমানুষের শরীর থেকে তার সমস্ত ভালখারাপ একসঙ্গে বেরিয়ে আসে। মেয়েদের সেটা শুধু বয়ে যেতে হয়। সুমিতকে তা যদি কখনও জানো তাহলে আমার একথার মানে বুঝতে পারবে। আমি বলছি, তুমি আর আপত্তি করো না। গিন্নীমাকে জানি। রাজী না হলে কাল তিনি তোমাকে ঠিক বের করে দেবেন।'

অমিতের ঘরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গিয়েছিল মঙ্গলা। কিশোর অমিত ওর খাটে ঘুমে কাদা হয়ে আছে। সারারাত বিছানায় বসে রইল তিস্তা। সে ইংরেজিতে অনার্স পড়তে কলকাতায় এসেছিল, না মধ্যযুগে বাস করছে ভেবে পাচ্ছিল না।

সকাল আটটায় মঙ্গলা এল ঘরে, 'বউমা স্নান করে নাও।'

তিস্তা জবাব দিল না।

'মন খারাপ করে বসে থেকো না। যা হচ্ছে ভালর জন্যে হচ্ছে।'

এইসময় দরজায় শাশুড়ির গলা পাওয়া গেল, 'থাক। এখন স্নান করতে হবে না। ফিরে এসে তো স্নান করতেই হবে। নার্সিং হোমের জামাকাপড়ে ঘরে ঢুকবে নাকি ?'

কিছুই করার নেই। মিনিট পনের বাদে তিস্তা শাশুড়ি আর মঙ্গলার মাঝখানে বসে ট্যাক্সিতে চেপে রওনা হল। যাওয়ার আগে সুমিতের কথা মনে হয়েছিল একবার। কিন্তু ইতিমধ্যে সে জেনে গেছে কোন লাভ নেই।

হঠাৎ তার মনে হল বাবার কথা। এসব ব্যাপার বাবা জানেন না। যদি তাঁর কানে যেত তিনি কি করতেন ? মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে এসে সিদ্ধান্ত বদল করার ক্ষমতা তাঁর নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু তিনি কি তিস্তাকে শ্যামনগরে নিয়ে যেতেন ? তার পর একদম একা হলে সে কি করে বাবার মুখের দিকে তাকাত ? সেই ছোট্টবেলা থেকে বাবা তার কাছে ভগবানের মত, যে ভগবান বন্ধু ছাড়া কিছু নয়। যখন প্রথম বুঝতে শিখল, কানপুরেও কাশফুলের জঙ্গলে দৌড়ে যাওয়া দুর্গা অপুর আনন্দে আনন্দিত হতে শিখল তখন থেকে সে এমন একটা কাজও করেনি যা বাবা অপছন্দ করেন। হ্যাঁ, সুমিতকে ভালবেসে বিয়ে করার সময় সে যুক্তি তৈরী করে নিয়েছিল। যে কাজ করলে মনে হবে না অন্যায় করছি সেই কাজ করাটাই স্বাভাবিক। এটা বাবারই শিক্ষা। সুমিতকে ভালবাসা অন্যায় ছিল না। ভালবেসে বিয়ে করাটাও ঠিক ছিল। কিন্তু এখন ? বারো বছরের তিস্তাকে বাবা যা যা শিখিয়েছিলেন তাতে সে কি কখনও এমনভাবে নার্সিংহোমে যেতে পারে ? হঠাৎ কেঁদে ফেলল সে শব্দ করে। পাশ থেকে

শাশুড়ি বলে উঠলেন, 'আঃ। এই জন্যে কারো উপকার করতে নেই।'

পার্ক সার্কাসে যেখানে ট্যাক্সি থামল সেখানে একজন লোক দাঁড়িয়েছিলেন। খুব লম্বা, ফর্সা, ধুতি পাঞ্জাবি পরা, স্টেনলেশের চশমা চোখে। এগিয়ে এসে তিনিই ভাড়া মিটিয়ে দিলেন, 'তোমরা ভেতরে গিয়ে বসো, ডাক্তার আসছে।'

'কত দেরি হবে?' শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করলেন।

'বেশী নয়। আজ বেশী কেস নেই বলল।'

লোকটাকে কখনও দ্যাখেনি তিস্তা। শাশুড়ির যে ভাই-এর কথা সে মাঝেমাঝে শুনেছে তিনিই হয়তো হবেন। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় মনে হল অন্ধকূপে ঢুকছে। স্যাঁতসেতে, অন্ধকার অন্ধকার চারদিক। ভিজিটার্স রুম বলতে যেটা রয়েছে সেখানে বিভিন্ন বয়সের মহিলা বসে। ওরা তিনজনে এক পাশের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। নার্সের পোশাক পরে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের দেখে একটুও ভক্তি হবার কথা নয়। একটা বিশ্রী গন্ধ আসছে নাকে। বেঞ্চির অন্য পাশে একজন রোগা প্রৌঢা বসেছিল। সে শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'মেয়ে?'

'না। বউমা।'

'অ। পরপুরুষ। ছেলে বুঝি বাইরে থাকে?'

'হ্যাঁ।' অম্লানবদনে বলে ফেললেন শাশুড়ি। তিস্তার শরীর এমনিতেই ঘিনঘিন করছিল এখানে এসে, শুনে মনে হল বমি হবে।

প্রৌঢ্য বলল, 'কয়মাস?'

'এক।'

'তাহলে চিন্তার নেই। আমি যাকে নিয়ে এসেছি তার সাড়ে তিন।'

'সাড়ে তিন?'

'কি করব? চেপে ছিল। শেষে না পেরে কাঁদাকাটি। পায়ে ধরে কাঁদলে তো না বলতে পারি না। বিধবা হয়েছে দুবছর তারপর এই কাণ্ড।'

'ভয় নেই কিছু?'

'বাড়তে দিলে যে ভয় তার থেকে তো বেশী নয়। আজ পর্যন্ত একশ বত্রিশটা কেস করিয়েছি, একটা ছাড়া কখনও ফেল করিনি।'

অদ্ভুত সব কথাবার্তা। এ ধরনের মানুষ আগে কখনও দ্যাখেনি। তিস্তা। তিস্তা প্রৌঢ্যার পাশে বসা মহিলাকে দেখল। শাঁখা সিঁদুর নেই। সাদামাটা চেহারা। মাথা নিচু করে বসে আছে। কি বিষণ্ণ।

দশটা নাগাদ ডাক এল। মঙ্গলার সঙ্গে ভেতরে ঢুকল তিস্তা। শাশুড়ি গেলেন না। শুধু মুখে বললেন, 'দুগ্গা দুগ্গা।'

তারপরের আধঘণ্টা তিস্তার জীবনে চিরকাল মনে থাকবে। একটা নোংরা নার্সিং হোমের টেবিলে অর্ধনগ্ন হয়ে শুয়ে সে যেভাবে মুক্ত হল তা ভোলার মত দিন কখনও আসবে না জীবনে। যখন ডাক্তার জানল সময়টা এক মাসের বেশী নয় তখন পুরো অজ্ঞান করার প্রয়োজনও বোধ করল না। ঘরে একজন নার্স, একজন অ্যানাসথেসিস্টের সঙ্গে ওরা মঙ্গলাকেও থাকতে দিল। তাকে যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখে নার্স মন্তব্য করেছিল, 'মজা লোটার সময় খেয়াল ছিল

না।'

কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত একটা যন্ত্রণা নিয়ে সে টেবিল থেকে উঠতে বাধ্য হল। তখনও রক্তপাত বন্ধ হয়নি। তাকে যে ঘরে শুইয়ে দেওয়া হল সেখানে যতই বোঁটকা গন্ধ থাকুক তা যেন তিস্তার নাকে ঢুকছিল না। চিৎ হয়ে শুয়ে চুপচাপ কেঁদে যাওয়া ছাড়া তার আর করার কিছু ছিল না। এই সময় নার্স তাকে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে বলল, 'একঘণ্টা ঘুমান। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অথচ ঘুম আসছিল না। একঘণ্টা বাদে শরীর নাড়তে পারল তিস্তা। ব্যথা কম কিন্তু কোমরের কাছটা আড়ষ্ট হয়ে আছে। মঙ্গলা বলল, 'এখানে না শুয়ে থেকে বাড়িতে গিয়ে শোবে চল। যা বদগন্ধ এখানে।'

'আমি হাঁটতে পারব না।' কেঁদে ফেলল তিস্তা।

'পারবে। আমার হাত ধরো।' মঙ্গলা যত্ন করে তাকে খাট থেকে নামাল। দু-পা তিন-পা সে হাঁটল। বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। তলপেটে যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। কিন্তু তিস্তারও মনে হল এই দুর্গন্ধময় জায়গা এখনই ছেড়ে যাওয়া উচিত।

তার আর এক প্রস্ত পোশাক সঙ্গে নিয়ে এসেছিল মঙ্গলা। যা পরে এসেছিল তা ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পরিষ্কারগুলো পরে সে মঙ্গলার হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এসে শাশুড়িকে দেখতে পেল। শাশুড়ির পাশে সেই লোকটি দাঁড়িয়ে। শাশুড়ি বলল, 'একটু অসুবিধে হবে প্রথমে, পরে ঠিক হয়ে যাবে। চল।'

মঙ্গলা না থাকলে যে তার কি হত! কয়েক পা হাঁটার পর পা যখন আর সরছিল না তখন মঙ্গলাই তাকে জড়িয়ে ধরে ট্যাক্সির দরজা পর্যন্ত নিয়ে এল। ভদ্রলোক ট্যাক্সিতে উঠলেন না, 'এই প্রেসক্রিপশন নাও। ওষুধ আনিয়ে নিও।'

ছোঁ মেরে সেটা নিয়ে মহিলা বললেন, 'তিনশ গেছে, তাতেও শান্তি নেই।' ট্যাক্সি চললে তিনি মঙ্গলাকে বললেন, 'হ্যারে, কাজ ঠিক করেছে তো?'

মঙ্গলা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেছিল।

বাড়িতে ঢুকেই শাশুড়ি বললেন, 'দাঁড়াও। ওপরে যাবে না।'

দাঁড়াতে পারছিল না তিস্তা। অসহায় চোখে তাকাল।

'নার্সিংহোমের জামাকাপড়ে ঘরে ঢুকবে কি? তোমার বাপমা কিছু শেখাননি দেখছি। যাও, নিচের বাথরুমে ঢোক। আমি ওপর থেকে কাপড় পাঠিয়ে দিচ্ছি।' শাশুড়ি হুকুম দিলেন। তিস্তা আস্তে আস্তে এগোল। এটা ঝি চাকরদের বাথরুম। মনে মনে বলল, আমার মা বাবা জানতেন না কখনও আমাকে অ্যাবরশনের জন্যে নার্সিংহোমে যেতে হবে। জানলে ঠিক শিক্ষা দিতেন।

বাথরুমে ঢুকতেই শাশুড়ির গলা ভেসে এল, 'ওখানে গামলা আছে?'

তিস্তা দুর্বল চোখে বাথরুমের এক কোণে সেটাকে দেখতে পেল। একগাদা কাপড় সাবানজলে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে। সে শব্দ করল, 'হ্যাঁ।'

'ওগুলো আওয়াজ করে কাচো। কি জানি বাবা, পেটে যদি কিছু এখনও

থেকে থাকে, ডাক্তারদের যা গল্প শুনতে পাই আজকাল।'

নিজের কানকে অবিশ্বাস করার কিছু ছিল না। শাশুড়ি আগে থেকেই এসব ভেবে ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সে কাতর চোখে গামলাটার দিকে তাকাল। এখন আর একটুও কান্না পেল না ওর। কোনরকমে দেওয়াল ধরে উবু হয়ে বসতেই যন্ত্রণাটা শুরু হল। সেই যন্ত্রণার মধ্যে একটার পর একটা কাপড় কেচে যাচ্ছিল সে শব্দ করে। হঠাৎ বাথরুমের দরজা খুলে গেল। হয়তো ভেতরে ঢুকে ভাল করে বন্ধ করেনি সে। মঙ্গলা দাঁড়িয়ে আছে, 'থাক। আর করতে হবে না। মুখ হাত পা ধুয়ে এগুলো পরে নাও।'

সারাটা দিন আচ্ছন্নের মত পড়েছিল তিস্তা। শেষ বিকেলে মঙ্গলা এসে এক গ্লাস গরম দুধ খাইয়ে গিয়েছিল সেইসঙ্গে কয়েকটা ট্যাবলেট আর ক্যাপসুল। তারপর আবার ঘুম। একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়ে রইল পনের ঘণ্টা। ঘুম ভাঙল যখন তখন চোখ না খুলেই কপালে হাতের স্পর্শ পেল সে। কেউ আলতো করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বেশ আরাম হচ্ছে। সে চোখ খুলতেই শাশুড়িকে দেখতে পেল। মাথার পাশে বসে আছেন।

'এখন কেমন লাগছে?'

তিস্তা জবাব দিল না।

'বোকা মেয়ে। যা করেছি তোমার ভালর জন্যে করেছি। দ্যাখো তো, এখন উঠতে পারবে কিনা। একটু বাথরুম থেকে ঘুরে এসো।'

পারল তিস্তা। খাট থেকে নেমে বাথরুমে যেতে কোন অসুবিধে হল না। শুধু মাথাটা ঘুরছিল তার। শাশুড়ি বললেন, 'দুর্বল তো হবেই। দুদিন পেটে কিছু পড়েনি যে।. এই সকালে চা বিস্কুট খাও। পরে ডিম আর রুটি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়েছিল তিস্তা। এটা তার আর সুমিতের ঘর ছিল একসময়। এখন সুমিতের। এঘরে শাশুড়ি ঢোকেন না, আজ ঢুকলেন।

'আর একটু ঘুমাবে?'

'না।'

'আজ আর বেরিয়ো না। বাড়িতেই বিশ্রাম নাও। বুঝলে?'

নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল তিস্তা।

শাশুড়ি উঠলেন, 'আমি পরে আসব। দরকার পড়লে ডেকো।'

চা নিয়ে এল মঙ্গলা, 'এই তো। বাব্বা! যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে। কিছুতেই মেয়ের ঘুম ভাঙ্গে না। নববাবু শেষে ডাক্তার ডেকে আনলেন।'

'নববাবু কে?'

'ওই যে! যিনি তোমার নার্সিং হোমের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তা ডাক্তার এসে অভয় দিল, ভয়ের কিছু নেই। নাও, খেয়ে নাও।'

চুপচাপ চা-বিস্কুট খেল তিস্তা। সুমিত কোথায়?

'কাকে খুঁজছ?'

'সুমিত নেই?'

'নাঃ। তিনি বিহারে গেছেন কাজের সন্ধানে। বউ গেছে নার্সিং হোমে

কিন্তু তার হুঁস হবে কেন ? বুঝলে বউমা, অনেক তো দেখলাম, ব্যাটাছেলের মত বজ্জাত যখন ভগবান সৃষ্টি করেছেন তখন তার প্রতি আর ভক্তি নেই বাপু।'

'ভগবানও ছেলে।'

'নইলে এই অবস্থা।'

'কিন্তু তোমার বাবা, আমার বাবা, অমিত, এরাও তো ছেলে !'

'ওই তো মুস্কিল। সব গোলমাল পাকিয়ে যায়।'

'তুমি খুব ভাল মঙ্গলা।'

'মোটেই না। সারা দিনরাত পাপের কাদা মাখছি।'

'একথা আগেও তুমি বলেছ। কেন তোমার এমন মনে হয় ?'

'তাহলে বলি। এই যে কলকাতার শ্যামবাজার বাগবাজার, শোভাবাজার আর আহেরিটোলা, এসব জায়গায় যারা থাকে তারা অনেকে পুরোন দিনের মানুষ। এককালে টাকা ছিল, প্রতিপত্তি ছিল। শুনেছি তখন বালীগঞ্জ নিউ আলিপুর হয়নি। এসব বাবুদের কেউ কেউ যাতে এদিকে কেউ টের না পায় তাই বালীগঞ্জে বাড়ি বানিয়ে মেয়েছেলে রাখতেন। তাদের নামে বাড়ি লিখে দিতেন। এ দিকের যারা ওসব করত না তারা বাগানবাড়িতে যেত। পয়সা যখন কমে এল তখন গ্রাম থেকে মেয়েছেলে তুলে নিয়ে আসা হল। বারো বছর বয়স হলেই একএকজন খোকাবাবুর সেবা করার জন্যে এক একজন পনের ষোল বছরের ঝি রাখা হত। মাইনে কম। পয়সা বেশী লাগছে না, আবার যৌবনে পড়ে খোকাবাবু বাইরে রাত কাটাবে না। ঝি-এর টানে ঘরেই ফিরবে। বাপের কাছে টাকা চেয়ে ঝামেলা করবে না। বিয়ের পরও কেউ কেউ ঝি-কে ছাড়ল না।'

'এর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি ?'

'আমার মা ছিল শোভাবাজারের এমনি এক লোক। খুব নামযশ ছিল। বড়গিন্নি মাকে ছাড়া দুর্গাপূজাই করতেন না। আমি জন্মালাম। বাপ ছিল একটা, বুঝতেই পারছ, নামেই বাপ। ও বাড়িতেই বড় হতে ন'বাবুর দায়িত্ব পেলাম। তখন তার দশবছর বয়স। আমি বারো। দশবছরের ছেলেকে ন্যাংটো করে স্নান করিয়ে দিতে হত। রাত্রে ঘুম পাড়াতে হত। বুঝতেই পারছ এরপর কি হতে পারে। কিন্তু আমার নাকি খুব নাম হল। অন্যবাবুরা তাদের মায়ের কাছে আমার জন্যে দাবী করতে লাগল। ন'বাবুও ছাড়বে না। তখন গিন্নী মা আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন। মজিলপুরে শ্বশুরবাড়ি। মাটির ঘর, মোটাভাত শহরের আরাম পেয়ে মাথা ঘুরে গিয়েছে তখন। মন টিকবে কেন ? দত্তবাড়ির বাবুদের মুখে আমার নাম তখন অনেকেই শুনেছে। উত্তর কলকাতার সেনেরা লোক পাঠাল। ভাল মাইনে, চলে এলাম। আমার মা একটা উপকার করেছিল। নানারকম শেকড়বাকড় চিনিয়ে দিয়েছিল। যেগুলো খেলে বাচ্চা হবে না, নষ্ট হবে। কত পাপ করেছি তার ফলে। নিজের স্বামীর কাছ থেকে একটা বাচ্চা পেয়েছিলাম। ফেলতে পারিনি। সেনবাবুরা বলল তাকে সঙ্গে রাখা চলবে না। বড্ড ন্যাওটা ছিল সে। কাছছাড়া হতে চাইত না। পাঠিয়ে দিলাম স্বামীর কাছে মজিলাপুরে। আমার

টাকায় ধানের জমি বাড়ল, মাটির ঘর ভেঙে দোতলা বাড়ি তৈরি হল। নিজে দাঁড়িয়ে স্বামীর আবার বিয়ে দিলাম। সে বেচারা কেন কষ্ট করবে বল ? এদিকে সেনবাড়িতে ভাগাভাগি শুরু হয়ে গেল। যে যার অংশ বুঝে নিয়ে বিক্রী করতে চায়। সুন্দরী শিক্ষিতা বউ এসেছে বাড়িতে। তারা সব বালিগঞ্জ নিউ আলিপুরে ফ্ল্যাট নিয়ে চলে যাবে। তখন বুড়ো কর্তাবাবুকে দেখাশোনা করতাম আমি। বুড়োর বয়স আশি তবু আমাকে স্নান করিয়ে দিতে হত। একসময় মনে ঘেন্না হল। কাজ ছেড়ে চলে গেলাম দেশে। ছেলে যুবক হয়েছে। বছর পনেরো বয়স। সতীন বলল, 'ওমা, একি কথা, পাকাপাকি থাকবে নাকি ?'

বললাম, 'লোকে তো নিজের ঘরে একটা সময় ফিরেই আসে।'

সে বলল কি জানো ? সাতসাগরে স্নান করে এই পানাপুকুরে ডুবে মরতে এলে আমি শুনব কেন ? বিয়ের সময় কথা হয়েছিল কখনও সতীনের সঙ্গে ঘর করতে হবে না। স্বামী আমাকে দেখে নরম হয়েছিল। শহরে আরামে থেকে আমার শরীর তার দ্বিতীয় পক্ষের থেকে বোধহয় ভাল ছিল। কিন্তু বেঁকে বসল পেটের ছেলে। স্পষ্ট আমার মুখের ওপর বলে দিল, 'সবাই বলে তুমি ভদ্দরলোকের ভাড়া করা মেয়েমানুষ। আমি তোমার সঙ্গে কিছুতেই থাকতে পারব না।'

বললাম, 'এই বাড়ি জমি কার পয়সায় হয়েছে ? ভাড়া না খাটলে পেতিস ?'

কিন্তু বুঝলাম আমি ওদের কাছে শেষ হয়ে গেছি। যদ্দিন সেনেরা ভাগ হয়নি তদ্দিন ওদের কাছে আমার কদর ছিল। বুড়ো কর্তা ছাদের ঘরে টিমটিম করছে, ট্যাঁকে চাবি নেই, আমারও আঁচলে কিছু আসছে না। ওরা তোয়াজ করবে কেন ?'

হাঁ করে এই কাহিনী শুনে যাচ্ছিল তিস্তা। বিমল মিত্র সাহেব বিবি গোলামে যেসব বৃত্তান্ত লিখেছেন তা থেকে কম অবাক করা জীবন নয়। মঙ্গলার গালে ঈষৎ মেচেতার দাগ। শরীর ভারী। বুক এবং নিতম্ব তো যথেষ্ট দৃষ্টিকাড়ার মত ভারী। দেখলেই মনে হয় পেছনে কোন রহস্য আছে। কিন্তু মানুষটা যে কত ভাল তা সে জানে। এই মানুষের কাহিনী শুনে সে একটুও ঘেন্না করতে পারছে না কেন ?

তিস্তা বলল, 'তারপর ?'

'ফিরে এলাম কলকাতায়। আট বছর আগেকার কথা। আমার বয়স কত বলতো ?

'বুঝতে পারছি না।'

'চল্লিশ। ষোলয় বিয়ে হয়েছিল। সতেরতে ছেলে। তা ফিরে উঠলাম ওই সেনেদের বাড়িতেই। সব ছেলেরা তখন যে যার ফ্ল্যাটে চলে গিয়েছে। গিন্নী মারা গিয়েছেন অনেকদিন। মাড়োয়ারী বাড়ি কিনে দয়া করে বুড়ো কর্তাকে থাকতে দিয়েছে। সেই মাড়োয়ারীদের ব্যবসা দেখাশোনা করত এ বাড়ির নববাবু।'

'ও।'

'তিনি বললেন, তুমি যদি ভাল কাজ চাও তাহলে আমার সঙ্গে মানিকতলায়

যেতে পার। মাস গেলে একশ টাকা আর খাওয়া পরা পাবে। বাকিটা যদি আদায় করতে পার তাহলে সেটা তোমার হাতযশ।'

'জিজ্ঞাসা করলাম, কি কাজ করতে হবে? আমি রান্নাবান্না ঘরমোছার কাজ কখনও করিনি। খোঁজ নিয়ে দেখুন।'

'সেটা আমি শুনেছি। ওরা খুব বর্ধিষ্ণু পরিবার। কর্তা উকিল। তার দেখা শোনার ভার নিতে হবে। দুই ছেলে আছে। একজন ষোল আর একজন চার। যদি দরকার হয় এদের দেখতে হবে। তবে কোন অবস্থাতে উকিলবাবু বাড়ি থাকলে তার কাছছাড়া হবে না। ওটাই তোমার চাকরি। এলাম এ বাড়িতে। গিন্নীমা আমায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। মনে হল খুশী হলেন। বললেন, আগে কাজের নমুনা দেখি তারপর রাখব কিনা বলব।'

'তারপর?'

'আর শুনতে চেও না বউমা।'

'আমি শুনব।'

'না। তাতে তোমার দুঃখ বাড়বে।'

'আমার আর কোন কিছুতেই দুঃখ নেই।'

'তা হোক। বউমা। পৃথিবীতে কোন কোন কথা আছে যা না শোনাই ভাল।' তিস্তা অবাক হয়ে মঙ্গলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার গিন্নীমা কেন সুমিতকে এত অপছন্দ করেন?'

'সুমিত উকিলবাবুর ছেলে, তাই।'

'নিজের স্বামীর ছেলেকে কি কেউ অপছন্দ করে?'

'কখনও কখনও করে। যখন মেয়েমানুষ স্বামীর কাছে কিছু পায় না, যখন স্বামীর খারাপ দিকটা ছেলের মধ্যে ফুটে ওঠে তখন সেই ছেলেকে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না।'

'সেগুলো কি?'

'শুনতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'উকিলবাবুর একসময় খারাপ অসুখ হয়েছিল। খারাপ পাড়ায় গেলে যে অসুখ হয়। সেই সময়েই সুমিত জন্মেছে। কথাটা জানার পরে গিন্নীমা আর উকিলবাবুর সঙ্গে এক বিছানায় শোয়নি। এখন উকিলবাবুর মাথার অবস্থা ঠিক নেই। কোর্টে গিয়ে কি করে কে জানে। গিন্নীমায়ের ধারণা এসব এই অসুখের জন্যেই হয়েছে। আর সুমিত যেহেতু তখনকার সন্তান তাই তাকে মানতে পারেন না উনি।'

'আর অমিত?'

'একথার জবাব আমার মুখ থেকে নাই বা শুনলে।'

'গিন্নীমা কাউকে ভালবাসেন?'

'হ্যাঁ। রোজ সন্ধের পর তিনি আসেন। মাঝরাত্রে চলে যান। আমার কাজ উকিলবাবুকে পাহারা দেওয়া।'

'সুমিত এসব জানে?'

'না জানার তো কিছু নেই। ওর মুখ বন্ধ।'

'কেন ?'

'আমি উত্তর দিতে পারব না।' মঙ্গলা হঠাৎ চলে গেল।

তিস্তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। যে পরিবেশে সে এতকাল বড় হয়েছে তার সঙ্গে এ সবের কোন মিল নেই। হঠাৎ তার মনে হল সুমিতের ব্যবহার কি স্বাভাবিক ! কোনদিন কি সুমিত কি তার মনের কথা বলেছে ? কেঁপে উঠল তিস্তা। সে চোখ বন্ধ করল। ভগবান। সুমিতের সন্তান তার শরীরে নেই এটা যেন বিরাট আশীর্বাদ বলে মনে হল। এ বাড়ির রক্ত সে বহন করছে না আর। যতই কষ্ট হোক এর চেয়ে আশীর্বাদ আর কিছুই নেই। তিস্তা বিছানায় শুয়ে পড়ল। নিজের বদলে মঙ্গলার জন্যে তার কষ্ট হচ্ছিল।

সুমিত এল দিন পাঁচেক বাদে। বেশ উৎফুল্ল হয়েই এল। তখন আবার আগের জীবনে ফিরে গিয়েছে তিস্তা। এবার আর শাশুড়ি তাকে অমিতের ঘরে শুতে বলেননি। আচরণে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি যা চান তার বাইরে এ বাড়িতে কিছু হবার উপায় নেই। দ্বিতীয়বারেও তিনি একই ঘটনা ঘটাতে দ্বিধা করবেন না।

তিস্তা অপেক্ষা করছিল সুমিত কখন তাকে জিজ্ঞাসা করে সেই তিক্তময় অভিজ্ঞতার কথা। তার জীবনে যে ঝড় বয়ে গেল যার সঙ্গে সুমিত জড়িত তার পরিণতির কথা জানতে চাইবে। কিন্তু সুমিত যেন কিছুই জানে না। কোন ব্যাপার সে জেনে যায়নি। খুব খুশীতে টগমগ করছিল সে। বলল, 'তুমি জানোনা কি দারুণ জায়গা। রাঁচি থেকে যেতে হয়। ওদের বাড়িটা বিশাল। অথচ তিনজন মাত্র লোক তিরিশজন চাকর ' ' তিস্তা শুনে যাচ্ছিল। তিরিশজন চাকর যে লোক নয় তা প্রথম বুঝতে হল ! সুমিত বলল, 'ম্যাডাম আমাকে ব্যবসাটা দেখাশোনা করতে বলেছেন।'

'ম্যাডাম কে ?'

'আমার বন্ধুর মা। ইনফ্যাক্ট বন্ধুর সৎমা।'

'ও, কিসের ব্যবসা ?'

'ওদের একটা মাইন আছে। অভ্রের। তার সেট আপ ভালই। কিন্তু ম্যাডাম মনে করেন একজন পারিবারিক মানুষ যদি ওভারঅল দেখাশোনা করে তাহলে ভাল হয়। তাছাড়া ল্যান্ড, বিস্তর জমি বিভিন্ন নামে ছড়ানো ছেটানো আছে। সেগুলোকে অর্গানাইজ করতে হবে। জঙ্গলের কিছু কন্ট্রাক্টরি ম্যাডামের নামে অ্যালটেড। হিউজ ব্যাপার।'

'বাঃ। খুব ভাল।'

'আর এইসব দেখতে গেলে আমাকে ওখানে গিয়ে থাকতে হবে।'

তিস্তা সুমিতের দিকে তাকাল। হঠাৎ তার মনে হল কলকাতা থেকে চলে যাওয়ার বাহানা দেখাবার জন্যেই সুমিত এতক্ষণ ওরকম উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছিল। সুমিত এখান থেকে চলে যেতে চায়। যে কাজগুলোর কথা সে বলছে তা করতে গেলে অবশ্যই অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। যিনি এতদিন ব্যবসা চালিয়ে এসেছেন তিনি কেন ওর মত অনভিজ্ঞ এক তরুণের হাতে এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন তাই সে বুঝতে পারছিল না।

তিস্তা বলল, 'ওসব জায়গা নিশ্চয়ই থাকার পক্ষে খুব ভাল।'

'ফ্যান্টাস্টিক। গরমকালে একটু কষ্ট হতে পারে কিন্তু বাকি সময়ে দারুণ।'

'তাহলে তোমার চলে যাওয়া উচিত। কলকাতায় এমন কাজের সন্ধান তুমি পাবে না। দেখলে তো এতদিন চেষ্টা করে।'

'হ্যাঁ। আই হেট ক্যালকাটা। তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ।'

'আমি? আমি কেন?' এইটে আশা করেনি তিস্তা।

'বাঃ। আমি ওখানে আর তুমি এখানে পড়ে থাকবে নাকি। ইন দিস ফিলদি হাউস? নো! তুমি আমার সঙ্গে যাবে।'

'দেখি।'

'তুমি বুঝছ না। দিস টাইম ভিখারির মত হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে নয়, বিশাল একটা বাংলো আমাকে ছেড়ে দেবেন ম্যাডাম। কুক, আর্দালি থাকবে।'

'আমার পড়াশুনা?'

'দূর!'

'তার মানে?'

'আর পড়ে কি হবে? এদেশে লোকে পড়াশুনা করে ভাল চাকরি পাওয়ার জন্যে। আমি যখন এটা পেয়ে গেছি তোমার তো কোন চিন্তা নেই!'

'সুমিত, আমার পরীক্ষা সামনে।'

'ওয়েল। তেমন বুঝলে কদিনের জন্যে এসে পরীক্ষা দিয়ে যেও।'

'ঠিক আছে ভেবে দেখি।'

সুমিত খুব খুশী হল না কথাটা শুনে। তিস্তা লক্ষ্য করল সুমিত তার সিগারেটের প্যাকেট পাল্টেছে। সাদা সাপটা হলদে প্যাকেটের বদলে দামী বিদেশী প্যাকেট। কদিন বাইরে গিয়ে লোকটা যেন প্রদীপের সেই দৈত্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এসেছে।

'মা তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছে?'

'যেমন করেন।'

'হুঁ। এবার মুখের ওপর জবাব দিতে হবে।'

'দিও।'

'ওভাবে আমার সঙ্গে কথা বল না। ওহো, ভুলে গিয়েছিলাম—।' সুমিত থামল। তিস্তার মনে হল এতক্ষণে সুমিতের খেয়াল হয়েছে। এবার নিশ্চয়ই তার অ্যাবরশন নিয়ে একটা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করবে।

'তিস্তা, তোমাকে একটা উপকার করতে হবে।' সুমিতের গলার স্বর নরম।

তিস্তা অবাক। তাহলে তার ভাবনাটা আবার মিথ্যে হল।

'ব্যাপারটা হচ্ছে, ম্যাডাম চান, এই যে এত বড় ব্যবসা আমি হ্যান্ডেল করব, কেউ যাতে কিছু মনে না করে তার জন্যে একটা ডিপোজিট আমি যেন, বুঝতেই পারছ, খুবই স্বাভাবিক। মায়ের কাছে আমি চাইব না। তোমার বাবাকে তুমি রাজী করাও।'

অদ্ভুত গলায় তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'তার মানে?'

'খুব সিম্পল। এই ধরো লাখখানেক টাকা আমাকে জমা রাখতে হবে। এই টাকায় ওঁরা হাতও দেবেন না। ইন্টারেস্ট যা পাওয়া যাবে তা আমার নামেই জমবে। যেদিন আমি চাকরি ছেড়ে দেব সেদিনই ওটা ফেরত পেয়ে যাব।

কি একটা নিয়ম:নুনের জন্যে ম্যাডাম এটা করতে বলেছেন। তুমি তো জানো, মায়ের কাছে আমি কিছুতেই হাত পাততে পারি না। তুমি তোমার বাবাকে বলো টাকাটা দিতে। ওঁর টাকা ওঁরই থাকবে। ক্লিয়ার ?'

নিজের কানকে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ নির্বাক চেয়ে রইল তিস্তা। তার রকম দেখে সুমিত হাসল, 'আরে! সমাধি হয়ে গেলে নাকি ?' 'আমার বাবার টাকা নেই।'

'কি যে বল। এত বছর চাকরি করলেন। বাইরে থাকলে খরচও কম হয়। তাছাড়া তোমার যদি নর্মাল বিয়ে হত তাহলে কত খরচ হত ভাবো তো ? আমরা তার অনেকটাই বাঁচিয়ে দিয়েছি। দিইনি। আবার ভেবো না আমি এতদিন বাদে বরপণ চাইছি। ওঃ, নেভার। আমি ওসবের বিরুদ্ধে তা তুমি ভাল করেই জানো। এটা আমায় একটু সাহায্য করা !'

'আমার বাবার টাকা নেই।'

'ঠিক আছে। আছে কি নেই তা তুমি আমার চেয়ে বেটার জানবে। এক কাজ করো, বেলেঘাটায় ওঁর যে জমিটা আছে সেটা আমার নামে লিখে দিতে বল। টাকা দিতে হবে না, আমি ওই জমিটাই ডিপোজিট করব। ম্যাডাম তাতেও রাজি।' 'আমার বাবার ওটা শেষ সঞ্চয়।'

'ফাইন ! সঞ্চয় তো উড়িয়ে দিচ্ছি না। আমি জমিটা দেখে এসেছি। আলোছায়া সিনেমা ছাড়িয়ে। হাজার আশি নব্বুই কাঠা হবে। নট ব্যাড্।'

'আমার পক্ষে বাবাকে বলা সম্ভব নয়।' 'কেন ?'

'নিজেকে নোংরা বলে মনে হবে।' 'নোংরা। আশ্চর্য। তুমি চাও না আমি জীবনে প্রতিষ্ঠা পাই ? তোমার বাবার একটা জমি পড়ে আছে। সেইটে দেখালে আমার হিল্লে হয়ে যায়। তুমি চাও না ?'

'না। আমি বাবার কাছ থেকে কিছুই নিতে চাই না।'

'তুমি ওঁর একমাত্র মেয়ে।'

'হোক। বাবা ছেলেবেলায় যা শিখিয়েছিলেন তা আমার যে কোন কাজে লাগেনি সেটা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। বার বার সেটা প্রমাণ করতে চাই না।' তিস্তা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু তার পথ আটকে দাঁড়াল সুমিত, 'দাঁড়াও।'

'তুমি আমাকে ভালবাসো না ?'

তিস্তা সুমিতের দিকে তাকাল। প্রথমে জবাব দেবে না বলে স্থির করল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সুমিত খপ করে ওর ডানহাত চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবরসনের আগের রাত্রের কথা মনে পড়ে গেল তিস্তার। তার গায়ে হাত তুলতে একটুও দ্বিধা করেনি এই লোকটা। সে নীরবে মাথা নেড়ে না বলল।

সুমিত হতভম্ব হয়ে গেল, 'ভালবাস না ?'

'না।'

হাত ছেড়ে দিল সুমিত। সে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

তিস্তা বলল, 'কাউকে একবার ভালবাসলে সবরকম পরিবর্তন সত্ত্বেও আজীবন ভালবেসে যেতে হবে এমন থিওরিতে আমি বিশ্বাস করি না।'

'গেট লস্ট। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।' চিৎকার করে উঠল সুমিত।

হঠাৎ মাথায় আগুন জ্বলে উঠল তিস্তার। যেন এই কথাগুলো শুনবে বলে সে এতদিন অপেক্ষা করছিল। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে নিজের স্যুটকেস টেনে নিয়ে তাতে জামাকাপড় গুঁজতে লাগল। সেটা দেখে সুমিত গড়গড় করল, 'তেজ দেখানো হচ্ছে। মেরে বিষদাঁত ভেঙ্গে দিলে তবে তেজ যাবে। বাপ সোহাগী মেয়ে। বাপের জমি যেন শ্রাদ্ধে লাগাবে। আরে আমি তোর বাপকে মাসে হাজার টাকা করে দিতাম, বলতেই পারিস মাগনা জমি দিবি না।'

এসব কথা কানে ঢুকছিল না তিস্তার। প্রায় অন্ধ এবং কালা হয়ে সে উঠে দাঁড়াতেই সুমিত আবার চেঁচাল, 'এই বাড়ির বাইরে একবার পা রাখলে আর কখনও এখানে ঢোকার অনুমতি পাবে না।'

তিস্তা স্যুটকেস নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। পেছনে সুমিত। অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে সে। মঙ্গলাকে দেখা গেল প্যাসেজে। সে কিছু বলতে এলে সুমিত চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার', কেউ ওকে বাধা দেবে না। তুমি যাও আমার ঘরে, আজকাল তো আমার খোঁজই নিতে চাও না।'

শাশুড়ির ঘরের দরজা বন্ধ। বাইরে যে ছেলে এমন ঝড় তুলছে তা তাঁর কানে ঢুকছে বলে মনে হয় না। বাঁক ঘুরতেই মঙ্গলা অথবা শ্বশুরের দরজার সামনে এসে পড়ল তিস্তা। হঠাৎ কানে এল কেউ একজন ডাকছে, 'এ্যাই বোকা মেয়ে!'

তাকিয়ে দেখল শ্বশুরমশাই, দরজায় দাঁড়িয়ে অদ্ভুত হাসি হাসছেন। তিস্তা দাঁড়িয়ে পড়ল। শ্বশুরমশাই বললেন, 'নো, নো পালানো। কালই আমি জজসাহেবের কাছে কেস ঠুকে দেব তোমার হয়ে। আমাকে ওকালতনামায় সই করে দাও। ও ছেলের ব্যবহার ওরকম তো হবেই। কেউ চায়নি অথচ জন্মে গিয়েছিল। এসো, আমার ঘরে এস। কাল সকাল সকাল কোর্টে গিয়ে প্রথমে দরখাস্তটা টাইপ করাতে হবে। আহা, ঠিক তোমার মত বউ চেয়েছিলাম আমি অথচ কপালে জুটল মঙ্গলা।'

কথা শেষ হওয়ামাত্র মঙ্গলা ছুটে এল। প্রায় ধাক্কা দিতে দিতে ভদ্রলোককে সে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এত রাত্রে কেউ বাড়ি থেকে বের হয়? হিন্দু মেয়েরা স্বামীর মুখে অনেক কথা শোনে, তাই বলে এমন হুট করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে? আশ্চর্য!'

'মা কোথায়?'

'গিন্নীমা এখন ঘুমাচ্ছে।'

'একটু ডাকো।'

'আমার ছাল ছাড়িয়ে নেবে এখন ঘুম ভাঙ্গালে। যা বলার কাল সকালে বলো। বউমা, মাথা গরম করো না।' মঙ্গলা যেন মিনতি করছিল।

'আমি মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'ওঃ। তুমি কবে বড় হবে।'

'মানে?'

'সত্যি তুমি কিছু জানো না, না চোখে ঠুলি পরে থাকে?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' নিচু গলায় বলল তিস্তা। ঠিক তখন সুমিত এসে দাঁড়াল সামনে, 'তিস্তা, আই অ্যাম সরি। আমি ক্ষমা চাইছি।

যেতে হয় কাল সকালে যেও। উত্তেজনায় যা বলতে চাইনি তাই বলে ফেলেছি।'

মঙ্গলা হাসল, 'যাও, এর পরে রাগ করে থেকো না।'

তিস্তা বলল, 'ঠিক আছে। আমি এখন বের হচ্ছি না। তবে ওর সঙ্গে আর একঘরে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

সুমিত জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ?'

'কারণ তুমি অমানুষ। আমি তোমাকে ঘেন্না করি।' তিস্তা অমিতের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কিশোর অমিত তখন দরজায় দাঁড়িয়ে। তাকে এগিয়ে আসতে দেখে সরে দাঁড়াল। ওর ঘরে আলো নেভানো ছিল। অমিত জিজ্ঞাসা করল, 'দাদার সঙ্গে তোমার কি হয়েছে ?'

তিস্তা দ্বিতীয় খাটে ধপ করে বসে পড়ল। তারপর মাথা নেড়ে না বলল।

'বউদি, তুমি দাদার থেকে অনেক ভাল।' অমিত কাছে এসে দাঁড়াল।

'তুমি শুয়ে পড় অমিত। আমার এখন কথা বলতে একটুও ভাল লাগছে না।' সরে গিয়ে জানলার পাশে বসল তিস্তা। তার বুকে চিনচিনে যন্ত্রণা দাঁত বসাচ্ছিল।

আশ্চর্য ! এতদিন পরেও মাঝে মাঝে সুমিত আচমকা হামলা করে। সুমিতের কোন বিশেষ ভঙ্গীর সঙ্গে অরিত্রর ভঙ্গী মিলে গেলেই এমনটা হয়। অথবা কোন বিশেষ প্রশ্নের জবাবে দুজনের কথা এক হয়ে গেলে এমনটা মনে আসে।

অথচ দুজনের স্বভাবচরিত্র আলাদা। অরিত্র মার্জিত, পড়াশুনা বেশী না হলেও সংস্কৃতিমনস্ক। কলকাতার শিল্পীসাহিত্যিক মহলে ভাল জানাশোনা আছে। সকলেই ওকে ভালবাসে। সুমিতের এসব কিছুই ছিল না। ঘুমন্ত অরিত্রর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিস্তার মনে হল যতই রাগ অভিমান করুক ও না এলে তাকে এখনও একা থাকতে হত। একা থাকায় হয়তো স্বস্তি আছে কিন্তু সেই স্বস্তি যে কি পরিমাণে কষ্টকর তা তার চেয়ে আর কে বেশী জানে ! সেদিক থেকে ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বর না দীপান্বিতা ? ওদের অফিসের একটু দেমাকী মেয়ে দীপান্বিতা আকাশবাণীর বি-হাই আর্টিস্ট। প্রায়ই রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান পায়। যত অপ্রচলিত কাঠ কাঠ গান ওর মুখে শোনা যায়। শৈলজারঞ্জনের ছাত্রী বলেই হয়তো প্রচলিত গান গাইলে সম্মান নষ্ট হবে এমন তার ভাব। দীপান্বিতার সঙ্গে তিস্তার সম্পর্ক ভাল ছিল। একবার তিস্তা বলেছিল, 'এবার আমি তোর গান বেছে দেব।'

'আমি যে রাতে মোর দুয়ারগুলি গাইতে পারব না।'

'তোকে গাইতে হবে না। ওই কঠিন ধ্রুপদাঙ্গ গান না গেয়েও মানুষের ভাল লাগবে এমন অনেক গান গাইতে পারিস। রবীন্দ্রনাথ অনেক বিশাল।'

দীপান্বিতা কথা শুনেছিল। কিন্তু জোর করে নিয়ে গিয়েছিল আকাশবাণীতে রেকর্ডিং-এর দিনে। সেখানেই আলাপ অরিত্র সেনের সঙ্গে। লোকটার কথাবার্তা ভদ্রলোকের মত। কিন্তু যে মানুষের সঙ্গে কখনও দেখা হয়নি আলাপ হয়নি তার সঙ্গে সেটা হওয়ামাত্র ঘনঘন দেখা হবে এমনটা কে

ভেবেছিল। আর সেটা যে ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তা বোধহয় বিধাতাই জানতেন। তিস্তা জানিয়ে দিয়েছিল সে কুমারী নয়। নামমাত্র বিবাহ নয়, বেশ কিছুকাল শ্বশুরবাড়িতে কাটাতে হয়েছে তাকে। ডিভোর্স পেতে অনেক ঝামেলা সহ্য করেছে। অরিত্র জানিয়েছিল সে-ও কুমার নয়। দশবছর সংসার করার পর চাকুরীরতা স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে বাধ্য হয়েছে। যেহেতু তার মা আর নতুন কোন ঝামেলা চান না তাই স্থির করেছিল বাকি জীবন একাই থাকবে। একদিন ভবানীপুরে ওর বাড়িতে নিয়ে গেল অরিত্র। দুপুরবেলায়। অরিত্রর মা পুরোন দিনের মহিলা। বেশ আদরযত্ন করলেন। বললেন, 'ছেলে যা ভাল বুঝবে তাই করুক।'

এসব যখন হয় তখন বোধহয় এভাবেই হয়। কোন নিয়ম মানে না, অঙ্কের ধার ধারে না। অফিস ছুটির পর কলকাতার সমস্ত রেস্টুরেন্টগুলো একে একে নতুন করে চেনা হয়ে গেল। শ্যামনগরের বাড়িতে ফিরত আটটার ট্রেন ধরে। সেটা এক ঘোরের মধ্যে কেটে যাওয়া সময়। আঠারো বছরের প্রথম প্রেম আর তিরিশের ইমোশনাল ইনভলভমেন্ট-এর মধ্যে ফারাক অনেক। কিন্তু কোথাও কোথাও মিলও তো ছিল।

প্রথম, যেদিন অরিত্র ওর সঙ্গে এসে মা-বাবার সামনে দাঁড়াল সেদিন তিস্তারই বুকের মধ্যে ছলাৎ ছলাৎ বেজেছিল। মা স্বাভাবিক গলায় অরিত্রর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। বাবার সেটা ছিল না। শুধু অরিত্রকে ট্রেনে তুলে দিয়ে যখন তিস্তা ফিরে এসেছিল তখন তিনি বলেছিলেন, 'ভোর এবং দুপুরের মধ্যে অনেক পার্থক্য। ভোরের ভুল কেউ দুপুরে করে না। এইটুকু মনে রেখে জীবনটা দ্যাখো।'

সেই প্রথম সরাসরি প্রশ্ন করেছিল তিস্তা, 'তোমার ওকে কেমন লাগল?'

'স্বাভাবিক। যেমন স্বাভাবিক মানুষকে প্রথম দেখলে মনে হয়।'

তারপরে বিয়ে। না, মন্ত্র পড়ে সানাই বাজিয়ে বিয়েতে দুজনেরই আপত্তি ছিল। সই করে নিজেদের সম্পর্কটাকে আইনসঙ্গত করে নিয়েছিল ওরা। অরিত্রর এক বন্ধুর ফ্ল্যাট ছিল সল্টলেকে। ভদ্রলোক বিদেশে চলে যাচ্ছিলেন চাকরি নিয়ে। তার ফ্ল্যাট ভাড়া নিল ওরা। বন্ধু বলেই মাত্র পনেরশো টাকার বারো'শ স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট পেয়ে গিয়েছিল। কোন সেলামি নয়। অতএব যত্নে সাজিয়ে তুলেছিল তিস্তা। অরিত্রর বন্ধুবান্ধবরা আসত। শখে পড়ে চীনে খাবারের সঙ্গে স্কচ হুইস্কি চলত একটু আধটু। সে বড় সুখের সময় ছিল।

কিন্তু বিবাহিত অরিত্র তার কাছে অন্য অভিজ্ঞতা। রাত দুপুরে বাড়ি ফিরে শুতে শুতে অরিত্রর দুটো বেজে যেত। প্রথম প্রথম জেগে থাকতে ভাল লাগত। কিন্তু সকালে চটপট না উঠলে অফিসে ঠিক সময়ে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে যাচ্ছিল। ব্যবস্থা হল অরিত্রর জন্যে খাবার হট বক্সে রাখা। আর এইটে অরিত্রকে অনেক সুবিধে করে দিল। মাঝরাতে বাড়ি ফিরে সে গড়িমসি করে খাবার খেত। সকাল দশটার আগে বিছানা ছাড়ার উপায় ছিল না। ফলে সাত সকালে বাজার, রান্না, রেশন, গ্যাস, ব্যাঙ্ক— সব কিছুর দায়িত্ব পড়ল তিস্তার কাঁধে। খারাপ লাগলেও মুখে কিছু বলেনি তিস্তা। সব মানুষ সবকিছু পারে না। অরিত্রও পারে না, এমনটা ভেবে নিয়েছিল। কিন্তু তারপরে মনে

হয়েছিল এটা কি ধরনের জীবন? একলা থাকতে না পেরে সে বিয়ে করেছিল। আর বিয়ে করে সেই একাকীত্ব কোথায় ঘুচল। অফিসে না যাওয়া পর্যন্ত যে সকাল সেই সময়ে বাড়িতে থেকেও অরিত্র গভীর ঘুমে। তখন তার সঙ্গে কথা বলা অসম্ভব। বেশিরভাগ দিন চুপচাপ বেরিয়ে যেতে হয়। কোন কিছু বলার থাকলে অরিত্র রাত্রে শোওয়ার সময় কাগজে লিখে টেবিলে চাপা দিয়ে রাখে। অফিস থেকে যখন বাড়ি ফেরে তখন দরজায় তালা। সারাটা সন্ধে একা কাটিয়ে একাই খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়া। অরিত্র যখন ফেরে তখন তিস্তা গভীর ঘুমে। তাহলে বিয়ে করে কোথায় তার একাকীত্ব ঘুচল? বিন্দুমাত্র নয়। বরং দায়িত্ব বাড়ল।

অরিত্র যা মাইনে পায় তার একাংশ মাকে দেয়। তিস্তার হাতে যা দেয় তাতে একটা মানুষের কোনমতে চলে যায়। এই কোনমতের মধ্যে পারফিউম, জামা প্যান্ট, লন্ড্রির বিল পড়ে না। অথচ অরিত্রর সেটা খেয়াল নেই। দায়িত্ব যে একবার বহন করে সে নিজের অজান্তেই একটু একটু করে বাড়তি ভার বহন করতে শেখে। তিস্তার সেই অবস্থা হয়েছিল। তবু অরিত্রর ছুটির দিনে বাড়ির আবহাওয়া অন্যরকম হত। কিছু বন্ধুবান্ধব আসত। এরা ওর অফিসের সূত্রেই পরিচিত। খাওয়াদাওয়া গানবাজনা হত। পুনশ্চর কবিতাগুলো চমৎকার আবৃত্তি করতে পারে অরিত্র। এই দিনগুলোর জন্যেই বেঁচে থাকতে ভাল লাগত।

সল্টলেকের সুখ বেশীদিন সইল না। অরিত্রর বন্ধু চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিদেশ থেকে চলে আসছিল। মাত্র পনের দিনের নোটিশ পেল ওরা। তড়িঘড়িতে কলকাতায় বাড়ি খুঁজতে গিয়ে নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা। সেলামি অথবা অ্যাডভান্সের ধাক্কার সঙ্গে ভাড়ার অঙ্ক ওদের যখন দিশেহারা করে তুলেছে ঠিক তখন নোনা চন্দনপুকুরের ফ্ল্যাটটার সন্ধান পাওয়া গেল। অরিত্র হিসেব করে দেখাল, রিক্সা ট্রেনের মাশুলিতে যা খরচ হবে তার সঙ্গে বাড়ি ভাড়া যোগ করলেও কলকাতা থেকে অনেক কম পড়ছে। ডানলপ থেকে ডালহৌসি যেতে যে সময় লাগে বারাকপুর থেকে তা লাগে না। তাছাড়া তিস্তার এতে সুবিধে হবে কারণ কাছেই শ্যামনগর। চট করে মা বাবার কাছে পৌঁছে যেতে পারবে। অতএব চলে আসা হল নোনা চন্দনপুকুরে অসীমবাবুর বাড়িতে। লোকাল ট্রেনে যাতায়াতের অভ্যেস তৈরী ছিল তিস্তার। কিন্তু তখন বাড়ি ফিরে রান্নাঘরে ঢুকতে হত না। দায় ছিল না কোন। এখন সেটা যোগ হওয়াতে তার ধকল বেড়েছে। আর এইসময় শরীরে তিনি এলেন।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই প্রথম প্রতিক্রিয়া ভাল ছিল না তিস্তার। অরিত্রর সঙ্গে এমন বসবাস, সংসারের চাপ, কেমন বন্ধুবিহীন হয়ে থাকা জীবনে আর একটি প্রাণ এলে তার দায়িত্ব যে সবটাই তিস্তাকে বহন করতে হবে এটা বুঝতে একটুও অসুবিধে ছিল না বলে সে রাজী হচ্ছিল না। কিন্তু অরিত্র বেঁকে বসল। তার আগের বিবাহিত জীবনে সন্তানের দেখা পায়নি সে। অতএব সন্তানের আকাংক্ষা তার তীব্র। সে নানান সহযোগিতার কথা বলে বলে সময়টাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল। আর তখনই কথাটা মায়ের মাধ্যমে বাবার কাছে পৌঁছাল। শ্যামনগর থেকে এক ছুটির দিনে তিনি এলেন। মেয়ের

মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এতদিন যা করেছ তা কিছুই নয়। এখন যা করবে তাই তোমার জীবনের সেরা কাজ। তবে আমি যতদিন জীবিত আছি ততদিন নিজে দায়িত্ব বহন করতে না পারলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।'

এটাই সবচেয়ে বড় ভরসার কথা। তিস্তা আর বিরূপ ভাবনা ভাবেনি।

এখন এই মাঝরাত পেরিয়ে যাওয়া সময়ে বিছানায় বসে তিস্তার মনে হল মানুষ কেন শুধু আশা দেখে যায়? আশা দেখা ছাড়া মানুষ হয়তো বাঁচতে পারত না কিন্তু সেটা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে হবে কেন? কেন বর্তমানকে সুন্দর করার জন্যে মানুষ বাঁচতে পারে না। পেটে যা এসেছে তাকে পৃথিবীতে আনতে গিয়ে যদি আমি মারা যাই তাহলে আমার কি লাভ হল? হ্যাঁ, এভাবে কোন মা চিন্তা করবে না। করাটা শোভন নয়। তবু এটা সত্যি। দীপান্বিতারা বলে তার শাড়ি পরার ধরনের জন্যেই নাকি চট করে বোঝা যায় না শরীরে সন্তান এসেছে। খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখলে ধরা পড়ে। আজ অন্ধকার শেয়ালদা স্টেশনে যে যুবক তাকে চা খাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল সে বেচারাও বোধহয় বুঝতে পারেনি। পারলে একশ হাত দূরে থাকত। নাকি কোন কোন জন্তুর এসব হুঁসও থাকে না। কথাটা তাকে অরিত্র বলেছিল কোন এক ছুটির দিনে, 'যাই বল, তোমাকে দেখে মনে হয় না এমন অ্যাডভ্যান্স স্টেজে আছো।' যেন তুমি এখনও মা মা চেহারা তৈরী করতে পারনি! দোষটা তোমার।

ভোরবেলায় আবার যন্ত্রণা শুরু হল। সেই পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ব্যথা। ওপর থেকে নিচে নেমে আসছে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছিল তিস্তা। শেষে আর পারল না। হাত দিয়ে ঠেলল অরিত্রকে। ঘুমের ঘোরে প্রতিবাদ জানাল অরিত্র। চিৎকার করে উঠল তিস্তা যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে। চিৎকার করে কেঁদে ফেলল।

অরিত্র ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। বিড় বিড় করল, 'কি হয়েছে?'

'আমি পারছি না। আমাকে নার্সিংহোমে নিয়ে চল।' ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছিল তিস্তা। অরিত্র হাঁ করে তাকিয়েছিল। যেন কোন কথাই তার মাথায় ঢুকছিল না। তারপর খেয়াল হতেই লাফিয়ে নামল বিছানা থেকে। খুব নার্ভাস গলায় বলল, 'কি করি! এখন তো রিক্সাও পাব না। সকাল অবধি—?'

'তুমি, তুমি মিসেস চক্রবর্তীকে ডাকো।' কোনমতে বলতে পেরেছিল তিস্তা।

তার আধঘণ্টা বাদে তিস্তা যখন ডক্টর মল্লিকের নার্সিংহোমে তখন আবার ব্যথাটা কমে এসেছে। ঘরে তখন কেউ নেই। জানলা দিয়ে সকালের আকাশ দেখছিল সে। একটু আগে পরীক্ষা করেছেন ডক্টর মল্লিক। ওঁর মুখ গম্ভীর ছিল। এখন আবার ঢুকলেন হাসিমুখে, 'চলে এসে ভাল করেছেন মা। আমি ভাবছি সিজার করব। কাল অথবা পরশু।'

'আপনি যা ভাল মনে করেন।'

'আপনার হাজব্যান্ড বলছিলেন শ্যামনগরে যাবেন খবর দিতে। আপনার বাবামায়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে। দুদিন আমরা অপেক্ষা করতে পারি।'

'এখনই করা যায় না ?'

হেসে ফেললেন ডক্টর মল্লিক, 'এখনও কিন্তু তারিখ আসেনি। তারিখ চলে গেলে পেইন না আনতে পারলে যেটা করি সেটা এখনই করতে হচ্ছে কেন জানেন ? আপনি মুক্তি পেতে চাইছেন। এর আগে ইস্যু হয়নি বলেছিলেন। কোন অ্যাবরসন ?'

'হ্যাঁ। হয়েছিল। আমার তখন আঠারো বছর বয়স।'

'কতদিনের ?'

'একমাসও নয়।'

'দ্যাটস নাথিং। মন চিন্তামুক্ত করুন। একটুও টেনশন রাখবেন না। পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান ভূমিকায় স্বাভাবিকভাবে পৌঁছানোটা কাম্য, তাই না ?'

সেই বিকেলে তাতান এল।

এবার ব্যথা শুরু হওয়ামাত্র নার্স লক্ষণ দেখতে পেলেন। যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়নি। তিস্তা স্পষ্ট অনুভব করল তার শরীরের ভেতর থেকে আর একটা শরীর বেরিয়ে এল পৃথিবীতে। খানিক বাদে একটা কান্নার আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত চেতনায় অদ্ভুত আরামবোধ ছড়িয়ে পড়ল। এত সুখ সে এ জীবনে পায়নি। চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। নার্স কানের কাছে ফিসফিস করছিল, 'এই যে, শুনছেন, শুনুন।' তিস্তা চোখ মেলেছিল।

নার্স হেসেছিল, 'আপনার মেয়ে হয়েছে। দারুণ সুন্দর।'

পরের সকালে যখন চারধারে ঝকমকে রোদ তখন তিস্তা মেয়ের চেহারা দেখল। অদ্ভুত শান্ত একটা পুতুলের মত কম্বলের ভাঁজে ঘুমিয়ে আছে। নার্স বলেছিল, 'এখন কিছুই বোঝা যাবে না। এই মুখ পাল্টে যাবে।'

সকালবেলায় সবাই মেয়ে দেখে বেরিয়ে গেলে অরিত্র তার পাশে বসে উদাসীন গলায় বলেছিল, 'আমার কপালে চিরকাল এমন হয়।'

শোওয়া অবস্থাতেই তিস্তা তাকাল মুখ ঘুরিয়ে, 'মানে ?'

'যখনই কিছু আশা করি তখনই জানি উল্টোটা হবে। তুমি ?'

'আমার কোন বিশেষ আশা ছিল না। যা পেয়েছি তাই ভাল।'

'এভাবে ভাবলে তো সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারতাম।'

'আমি কিন্তু ভেবেও হইনি।'

কথাবার্তা এগোয়নি। কথা বলার মত অবস্থাও ছিল না। মেয়ে হয়েছে বলে অরিত্রর মন খারাপ হলে সে কিছুই করতে পারে না। ওর মন খারাপ যে কারণে সেই কারণটাকে কিছুতেই সমর্থন করে না তিস্তা। তবে হ্যাঁ, পৃথিবীতে এসে আরও একজনকে লড়াইতে নামতে হবে যদি না ততদিন সামাজিক অবস্থাটা পাল্টায়। এখনও এদেশে মেয়ে মানে প্রতিমুহূর্তে লড়াই-এর জীবন যদি না সে দাসীবাঁদী হয়ে থাকতে চায়। তিস্তা জানে তার মেয়ে কখনই সেরকম হবে না। কিন্তু সেই সময় আসবে আরও আঠারো কুড়ি বছর পরে। তদ্দিনে কি চেহারাটা বদলাবে না ?

এই দশ বছরে কত বদলে গেল। দশ বছর আগেও শীতকালে রাস্তায় মোজা পরা মেয়ে ক'টা দেখা যেত ? হেসে ফেলল তিস্তা। কি অদ্ভুত একটা

দৃষ্টান্তের কথা ভাবল সে। অদ্ভুত কিন্তু সত্যি। মেয়েদের জন্যে চটি পরা পায়ের মোজা বের হল তো এই সেদিন। সুমিতদের বাড়িতে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। এখনও পারে কি না তার জানা নেই। সেই রাত্রে বেরিয়ে আসতে না পারলেও আরও মাস ছয়েক তাকে থাকতে হয়েছিল। ছ'টা মাস তার জীবনের অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছিল।

কানের কাছে অহরহ জমিটা লিখে দেবার প্রস্তাব শুনতে শুনতে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল তিস্তা। শাশুড়িকে গিয়ে কথাটা জানিয়েছিল। সব শুনে ভদ্রমহিলা অদ্ভুত কথা বললেন, 'দ্যাখো বউমা, মেয়েমানুষের জীবনে স্বামীর ঘরের কোন বিকল্প নেই। ও যদি ভাল চাকরি পেয়ে তোমায় নিয়ে আলাদা সংসার পাতে তাহলে তোমার বাবার উচিত জমিটা ওর নামে লিখে দেওয়া। আমি তো একটা টাকাও দেব না, তোমার বাবাও যদি না দেন তাহলে ও বেচারা কোথায় যায় বল দেখি।'

'আপনি দিচ্ছেন না কেন?'

'কারণ আমার যা আছে তা আমি ছোটটার জন্যে রাখব।'

'কিন্তু ও তো আপনারও ছেলে!' ইচ্ছে করে খুঁচিয়েছিল তিস্তা।

'হ্যাঁ। আমিই বিইয়েছিলাম। বাধ্য হয়েছিলাম। ওর বাপ শেয়ানা উন্মাদ। আমার বাবাকে মিথ্যে কথা বলে এ বাড়িতে বিয়ে দেওয়ানো হয়েছে।' হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে গেলেন মহিলা, 'না। তোমার সঙ্গে এই নিয়ে কোন কথা বলতে চাই না।'

বাবা আসতেন খবর নিতে। কিন্তু কখনই তিস্তা তাঁকে সুমিতের ইচ্ছের কথা বলতে চায়নি। শেষপর্যন্ত চলে গেল সুমিত বিহারে। আর তার ফলে তিস্তা পরীক্ষা দিতে পারল নির্বিঘ্নে।

মাস দুয়েক বাদে সুমিত এল। তার চেহারা পাল্টে গিয়েছে। বেশ চকচকে হয়েছে। জামাপ্যান্টও দামী। বিদেশি পারফিউম ব্যবহার করছে। সুমিত জানাল সে এখন পুরোদমে চাকরি করছে। ম্যাডাম তার ওপর খুব খুশী। উনি বলেছেন সে যেন তিস্তাকে নিয়ে একবার ওখান থেকে ঘুরে আসে। এখন তিস্তা যদি যেতে রাজী না হয় তাহলে তার সম্মান থাকবে না। ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তিস্তার মনে হল সব মানুষের একটা না একটা সময়ে পরিবর্তন আসে, সুমিতেরও হয়েছে। অন্তত ওর চালচলন কথাবার্তা যদি চাকরির কারণে পাল্টে গিয়ে থাকে তাহলে সেটা হওয়া অসম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে পুরোন জেদ আঁকড়ে ধরে থাকার কোন মানে হয় না। সে যেতে রাজী হল।

রাঁচি এক্সপ্রেসে রাঁচিতে পৌঁছাতে সকাল। সেখান থেকে ট্রেন বদলে যে স্টেশনে নামল সাধারণত রমাপদ চৌধুরীর প্রথমদিককার উপন্যাসে সেইরকম স্টেশনের বর্ণনা পাওয়া যেত। ভাল লাগল তিস্তার। স্টেশনে গাড়ি ছিল। সেটা তাদের নিয়ে এল গেস্ট হাউসে। পাশেই রাজকীয় মহল। সুমিত জানাল ওটা ম্যাডামের বাড়ি। তিনি এখন বিলেতে আছেন।

কুমারসাহেব রঙ্গলাল সুমিতের বন্ধু। বেশ শান্ত সুন্দর চেহারার যুবক। তিস্তার সঙ্গে যেচে এসে আলাপ করে গেল। বলল, 'বিকেলে মহলে আসুন।' চমৎকার বাংলা বলে। চলে যাওয়ার পর সুমিত বলল, 'লালের সঙ্গে ভাল

ব্যবহার করো। ও ইচ্ছে করলে ম্যাডামকে বলে ডিপোজিটের ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে পারে। তিস্তা জানল ম্যাডামের বয়স ছত্রিশ। রঙ্গলালের বাবা মোহনলাল ষাট বছরের বৃদ্ধ। তিনি শয্যাশায়ী। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মহলে আসার পরেই ওঁর স্ট্রোক হয়। সেই থেকে আর বিছানা ছাড়েননি। এতবছর ধরে ম্যাডাম স্বামীসেবা করে গেছেন। নিজের ব্যক্তিগত সুখের কথা ভাবেননি। এই যে তিনি বিলেতে গিয়েছেন তাও স্বামীর জন্যেই। ডক্টর বার্নাড নামের এক চিকিৎসকের সঙ্গে স্বামীর আরোগ্য নিয়ে আলোচনা করতে। যদি সম্ভব হয় তিনি ডক্টর বার্নাডকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন। রঙ্গলালের ব্যবসায় মন নেই। ফলে ম্যাডাম সুমিতের ওপর নির্ভর করতে চান।

সুমিত যে কাজে ডুবে গেছে তার প্রমাণও পেল তিস্তা। গেস্ট হাউসে পৌঁছে রঙ্গলালের সঙ্গে কথা শেষ করেই সেই যে সে কাজে বেরিয়ে গেল ফিরে এল সন্ধ্যায়। ক'দিন কলকাতায় যাওয়ায় যেসব গাফিলতি দেখতে পেয়েছে তাই ওর মাথায় গিজগিজ করছে। স্নান সেরে তৈরী হয়ে সে তিস্তাকে নিয়ে মহলে গেল। বিয়ের পর সেদিনই প্রথম চমৎকার সেজেছিল তিস্তা। সুমিত পর্যন্ত বলেছিল, 'দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে।'

রঙ্গলাল ওদের চমৎকার চা খাবার খাইয়েছিল মহলের বৈভব দেখে মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড়। কয়েক পুরুষের সঞ্চিত স্মৃতিচিহ্নের সঙ্গে আধুনিক জীবনযাত্রার অদ্ভুত মিশেল সেখানে। রঙ্গলাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাল ? একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'এ হল আমার বাবার জায়গা। আমি আপনাকে ওখানে নিয়ে যেতে চাই না।'

'কেন ?' তিস্তা প্রশ্ন করেছিল।

'উনি অশ্লীল শব্দ ছাড়া কথা বলতে পারেন না। এত বছর বিছানায় শুয়ে থেকে সুস্থ মানুষ দেখলে সহ্য করতে পারেন না। আপনি বরং মায়ের ঘরে চলুন। দেখার মত ঘর।' রঙ্গলাল বলেছিল।

সত্যি দেখার মত ঘর। দেওয়ালের সিমেন্ট দেখা যায় না, পুরো দেওয়াল জোড়া ওয়ানপিস আয়না। আয়নাগুলো ইতালিতে তৈরী। দাঁড়ানো মাত্র ওর মনে হল চার তিস্তা চারদিক থেকে ঘরে ঢুকল। পায়ের তলায় পারস্যের কার্পেট। ফার্নিচারগুলো অত্যন্ত আধুনিক। খাটের দিকে তাকালে বোঝা যায় এটি যিনি ব্যবহার করেন তিনি কতখানি সৌখিন। সুমিত আর রঙ্গলাল কথা বলছিল। তিস্তা ড্রেসিং টেবিলের সামনে গেল। প্রায় শ'খানেক বিদেশি পারফিউম। অধিকাংশের নাম সে এর আগে শোনেনি। বাইশ রকমের চিরুনি রয়েছে। গুনল তিস্তা। একটা কি হাতির দাঁতের ? কোন কিছু না ভেবেই সে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার ধরে টানল। গোল করে রাখা একটা তার, তারের একপাশে প্ল্যাক অন্য পাশে অদ্ভুত দেখতে একটা জিনিষ। লম্বা গোলাকার একটা বস্তুর গায়ে যেন কাঠালের ভূতি লাগান হয়েছে। সে বিস্মিত গলায় দূরে দাঁড়ানো রঙ্গলালকে প্রশ্ন করল, 'এটা কি জিনিষ ? অদ্ভুত দেখতে তো !'

আড়চোখে দেখে নিয়ে রঙ্গলাল বলল, 'ছেড়ে দিন।' কথাটা বলার সময় রঙ্গলালকে বেশ অস্বস্তিতে পড়তে দেখল তিস্তা। সে সামান্য ঝুঁকে জিনিষটাকে দেখতে যেতেই রঙ্গলাল এগিয়ে এল, 'ফরগেট দ্যাট '

'কেন ?'

এই প্রশ্নটা করামাত্র তিস্তার মনে হল বড্ড বেশী কৌতূহল দেখিয়ে ফেলেছে। অনেক আগেই তার চুপ করে যাওয়া উচিত ছিল। সে ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে সরে এল।

পাশের ঘরটি লাইব্রেরি। দেওয়ালজোড়া বই। এটাও নাকি ম্যাডামের সংগ্রহ। কি বই নেই সেখানে। রঙ্গলাল কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যেতেই সুমিত কাছে এগিয়ে এল, শোন, তুমি লালকে একটু অ্যাটেন্ড করো।'

'বুঝলাম না।'

'ওঃ, মাঝে মাঝে তুমি এমন ভাব করো যে গ্রাম থেকে সবে এসেছ। তখন বললাম না, আমার ডিপোজিটের টাকাটা একমাত্র লালই ওর মাকে বলে ম্যানেজ করে দিতে পারে। ও আমার সঙ্গে পড়ত কিন্তু শুধু সেই কারণে এতটা করবে না। তোমার বাবার কাছ থেকে যখন এনে দিলে না তখন এটুকু কর।'

'কি করতে হবে ?' তিস্তার গলায় অন্য সুর।

'কিছুই না। একটু কম্পানি দেবে। ও কবিতা পড়লে শুনবে। দ্যাটস অল।'

'আর কিছু ?'

'দ্যাখো, এখানে এসে নাটক করো না।' সুমিত কথাটা শেষ করামাত্র ঘরে ঢুকল রঙ্গলাল। ঢুকে দেরি হবার জন্য বিনয় দেখিয়ে বলল, 'আমার স্ত্রীর শরীরটা আজ ভাল নয়। ও আগামীকাল আপনার সঙ্গে আলাপ করবে।'

রঙ্গলাল বিবাহিত জেনে তিস্তা খুশী হল। পরে ভেবেছিল কেন তার ওরকমটা হয়েছিল। বিবাহিত পুরুষকে সে নিরাপদ প্রাণী বলে ভেবেছিল ? অদ্ভুত।

সুমিত ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'কি হয়েছে ?'

'ঠিক কি হয়েছে আমি জানি না।'

'ডাক্তার সাহেব এসেছেন ?'

'ওটা তোমার ডিপার্টমেন্ট।'

সুমিত তিস্তাকে বলল, 'তোমরা কথা বল আমি ঘুরে আসছি।' সে বেশ দ্রুত লাইব্রেরিঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তিস্তার বোধগম্য হচ্ছিল না। স্ত্রী অসুস্থ অথচ স্বামী তেমন চিন্তিত নন, সুমিতের আচরণে মনে হল সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। ওর চাকরির শর্তে কি বন্ধুর স্ত্রীকে দেখাশোনা করাও আছে ? রঙ্গলাল বলল, 'আপনার স্বামী এখানে আসার পর আমাদের অনেক চিন্তা দূর হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি, আমি আর বিমলা ঠিক ক্লিক করছিলাম না। সুমিত এসে সেটাকে চাপা দিতে পেরেছে।'

'আচ্ছা ! আপনার বন্ধু আর কি করল ?'

'ওতো চমৎকার কথা বলতে পারে। মা খুব খুশী। আসলে এখানে মা কথা বলার উপযুক্ত মানুষ পেতেন না। বাবাকে দেখাশোনা করে এস্টেট চালিয়ে উনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। সুমিত আসায় ওঁর মনমেজাজ ভাল হয়ে গেছে অনেক।'

'আপনি এখানেই থাকেন ?'

'না, না। বেশীরভাগ সময় কলকাতায়। মা বিকে যাওয়ায় স্ত্রীকে নিয়ে এখানে এসেছি। বাবা একা আছেন তো। তা আসার পর থেকেই বেচারা খুব মন খারাপ করে আছে। এখানে পার্টি নেই, ফ্রেন্ডস নেই, খুব ল্যোনলি। আমি তো বলি মা কিভাবে আছেন তাহলে বোঝ ! যাকগে ! কবিতা শুনবেন ?'

'আপনার লেখা ?'

'হ্যাঁ। ওই আমার হবি বলতে পারেন।'

'বাংলা ?'

'না। বলতে পারি কলমে আসে না ঠিক। হিন্দীতে।'

অতএব সোফায় বসতে হল তিস্তাকে। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে একই লাইন বারংবার আবৃত্তি করতে করতে একটা বিশাল কবিতা শেষ করল রঙ্গলাল।

হিন্দী ভাষাটা ভালই জানে তিস্তা। বুঝতে অসুবিধেও হয়নি। রঙ্গলালের কবিত্ব এই জীবনে কতখানি পরিপূর্ণতা পাবে তাতে ঢের সন্দেহ হচ্ছিল। আবৃত্তি শেষ করে কাছে এল রঙ্গলাল, 'কেমন লাগল ?'

'বেশ সহজ।'

'এটা আমার কাছে বিরাট কমপ্লিমেন্ট। সহজ কথাটা কে সহজভাবে বলতে পারে ! আমার স্ত্রী এসব শুনতে চায় না। আসলে মনের ব্যাপারটা সকলে ঠিকঠাক বোঝে না। আমার খুব ভাল লাগছে আপনার পছন্দ হয়েছে বলে। আর একটা কবিতা আমি লিখেছিলাম যৌনবিষয় নিয়ে। শুনবেন ?'

'সুমিত ফিরে এলে শুনলে হত না ?'

'সুমিত ? ও এত তাড়াতাড়ি ফিরবে বলে ভাবছেন নাকি ?'

'কেন ?'

'মরুভূমিতে এক টুকরো মেঘ উড়ে গেলে যেমন আর ফিরে আসে না তেমনি আমার স্ত্রীর লোনলিনেশ ওকে ফিরতে দেবে না। না, মানে মেঘের মত চিরকালের জন্যে নয়, অন্তত ডিনার পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

'আমি বুঝতে পারছি না, আপনার স্ত্রীর লোনলিনেশ সুমিত কি করে সমাধান করবে ! ওর চাকরি কি এটাই।'

'পার্টলি।'

'আমি গেস্ট হাউসে ফিরে যেতে চাই।'

'সেকি ? এখনই ?'

'হ্যাঁ। আমার ভাল লাগছে না।'

'কি ভাল লাগছে না ? সুমিত সম্পর্কে না আমাকে ?'

'আমি আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না।'

'দেখুন, আমি খারাপ লোক নই। আমাদের প্রচুর টাকা, প্রচুর সম্পত্তি কিন্তু আমি কবিতা লিখি, মদ খাই না, মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করতে পারি না। চাই না বলে পারি না নয়, পারি না বলেই চাই না। অতএব আমার কাছে আপনি নির্ভয়ে বসে থাকতে পারেন। এ বাড়িতে এতদিন সবকিছু অ্যাবনর্মাল ছিল। সুমিত আসার পর একটু একটু করে নর্মাল হয়ে আসছে। একটু আগে মায়ের

ড্রেসিং টেবিলে যে যন্ত্রটাকে দেখলেন সেটা আর ব্যবহৃত হয় না। এখানে এলে আমার স্ত্রীর মেজাজ শান্ত থাকে। আমি চমৎকার কবিতা লিখতে পারি।' রঙ্গলাল হাসল।

উঠে দাঁড়াল তিস্তা, 'আর আপনাদের ব্যবসা ? মাইন, জঙ্গল, চাষবাস ?'

'বাবা অসুস্থ হবার পর মা একটা কাজ করেছিলেন বুদ্ধিমতীর মত। সবকিছু তিনি তিনটে লিমিটেড কোম্পানির আন্ডারে নিয়ে গেছেন। বছরে কয়েকবার বোর্ড মিটিং-এ অ্যাটেন্ড করা ছাড়া আমাদের কিছুই করার নেই। চাষবাস অবশ্য লোক দিয়ে করাতে হয়। বাট উই আর নট ইন্টারেস্টেড।'

'সুমিত বলেছিল আপনারা ওকে ব্যবসা দেখাশোনার চাকরি দিয়েছেন।'

'বলেছিল বুঝি। হয়তো মা ওকে তাই দিয়েছেন।'

'কিন্তু আপনার কথায় তো সেটা মনে হচ্ছে না।'

'আমার ওই একটা দোষ। বেশী বলে ফেলি। কবিতাতেও, জানেন।'

তিস্তা ঠোঁট কামড়ালো। সে সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিল। রঙ্গলাল যে পরিবারের ছেলে তাতে তার যে আচরণ করা স্বাভাবিক ছিল তা করছে না কারণ ওর মস্তিষ্ক বোধহয় পুরোপুরি ঠিক নেই। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কবিতার হবি কি করে হল আপনার ?'

'মা। মা ব্যাপারটা আমার মধ্যে ঢুকিয়েছেন। শী ইজ লাইক এ কুইন। আমার অনেক কবিতা ওঁকে নিয়ে লেখা।'

'আপনি আমার একটা উপকার করবেন ?'

'ও সিওর ! বলুন।'

'এখন কলকাতায় ফিরে যাওয়ার ট্রেন আছে ?'

'এখন ?' ঘড়ি দেখল রঙ্গলাল। তারপর এগিয়ে গিয়ে ইন্টারকমের বোতাম টিপে একই প্রশ্ন কাউকে করল। জবাবটা পেয়ে রিসিভার রেখে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। আর ঘন্টা দেড়েক বাদে একটা মেইল ট্রেন আছে।'

'আমি আজই কলকাতায় ফিরে যেতে চাই।'

'সেকি ? আজই এসেছেন আপনি, ফিরে যাবেন বললেই হল। মা ফিরে এসে এটা শুনে ভাববেন নিশ্চয়ই আমি আপনার সঙ্গে অভদ্রতা করেছি তাই আপনি থাকতে পারলেন না।'

'মোটেই নয়। আপনি আমার সঙ্গে যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করছেন।'

'তাহলে আপনি চলে যেতে চাইছেন কেন ?'

'আমার ঘেন্না লাগছে, তাই।'

'ঘেন্না ? হোয়াটস দ্যাট ? ঘৃণা ?'

'হ্যাঁ। আরও জোরালো।'

'আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট ফিলিং। আমার কখনও মনে ঘেন্না আসেনি। ওটা আপনার মনে কেন এল বলুন তো ? দেখি একটা কবিতা লেখা যায় কিনা !'

'আপনি আমার অনুরোধ রাখুন।'

'অসম্ভব। কাল যান পরশু যান, নট দিস নাইট।'

হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল তিস্তার, 'আপনি কিরকম পুরুষ ? আপনার স্ত্রীকে সঙ্গ দিচ্ছে সুমিত আর আপনি এখানে চুপ করে বসে আছেন ?'

রঙ্গলাল মাথা নাড়ল, 'সেটা আপনারও প্রব্লেম। অন্য এক নারীকে সঙ্গ দিচ্ছে আপনার স্বামী, কি রকম নারী আপনি যে এখানে বসে আছেন ?'

'ওই কারণেই আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।'

'বাট নট বিফোর আমি আপনাকে দেখি।'

'আমাকে দেখবেন মানে ?'

রঙ্গলাল হাসল, 'কথাটা আমি বলতে পারি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনার ভাল লাগবে না। সুমিতের কথা শুনে আপনাকে এমন অ্যারোগান্ট মনে হয়নি।'

'আপনি বলুন, আমি সব কিছু শুনতে তৈরী আজ।'

'ওয়েল, আমার নেক্সট কাব্যগ্রন্থে এক মানবীর বর্ণনা আছে। ব্রহ্মা তাকে সৃষ্টি করেছেন সমুদ্রের ভেতর। সূর্যদেব উদিত হলে সেই মানবী সমুদ্রের গভীর থেকে ধীরে ধীরে তীরে উঠে আসছে হেঁটে। সমুদ্রজলে সিক্ত অবস্থায় তার শরীরে রোদ পড়ায় অদ্ভুত সৌন্দর্য জন্ম নিল। সেই সৌন্দর্যের বর্ণনা আমি করতে পারছিলাম না। কলকাতায় টাকা দিয়ে অনেক নারীর শরীর দেখেছি আমি কিন্তু তারা আমার মানসীর ধার কাছ দিয়ে যায় না। আমার স্ত্রী বলে সে গিনিপিগ হতে রাজী নয়। অবশ্য তার শরীর একটু হস্তিনী টাইপ, ওই মানসীর সঙ্গে মেলে না। সুমিত আমাকে বলল ওর স্ত্রীর ফিগার খুব ভাল। আমি যদি আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারি তাহলে আপনি দর্শনে আপত্তি করবেন না।'

'কিভাবে সন্তুষ্ট করবেন ?' দাঁতে দাঁত চেপে বলল তিস্তা।

'সুমিতের কিছু প্রয়োজন আছে। সেগুলো মিটিয়ে দিয়ে।'

তিস্তা চোখ বন্ধ করল। সেটা দেখে রঙ্গলাল বলল, 'আপনি নিশ্চিত থাকুন। আর্ট কলেজে যেমন ছেলেমেয়েরা মডেলের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকে এও তেমনি। আমি মানসপটে ছবি আঁকব। আপনাকে স্পর্শ করব না।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমি একটু গেস্ট হাউসে যাব।'

'কেন ?'

'ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। আমি খুশী হলাম আপনি ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছেন না। চলুন, আপনাকে আমি এগিয়ে দিয়ে আসি।'

মহল থেকে বেরুবার সময় অনেক সেলাম কুড়িয়ে রঙ্গলাল বলল, 'সত্যি, আপনি খুব অদ্ভুত মহিলা। আমার স্ত্রীর চেয়ে অদ্ভুত।'

গেস্টহাউসের দারোয়ানকে ডেকে রঙ্গলাল হুকুম করল, 'মেমসাহেব যা বলবে তাই সঙ্গে সঙ্গে করে দেবে।' তারপর তিস্তার দিকে ফিরে বলল, 'এক ঘণ্টা পরে আমাদের দেখা হতে পারে মায়ের ঘরে ?'

'মায়ের ঘরে ?'

'হ্যাঁ। ওই ঘরে কোন দেওয়াল নেই দেখেছেন নিশ্চয়ই। নীল আলো জ্বালিয়ে দিলে সমুদ্রের মত মনে হবে। আমি এসে নিয়ে যাব, কেমন ?' রঙ্গলাল চলে গেল।

ঘরে ঢুকে একটুও সময় নষ্ট করল না তিস্তা। স্যুটকেস থেকে যা যা বের করেছিল সব চটপট আবার ঢুকিয়ে নিল। আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় আছে। ট্রেন যদি ঠিক সময়ে থাকে তাহলে যে করেই হোক তাকে পৌঁছাতে হবে। আসার সময় গাড়িতে আধঘণ্টা লেগেছিল। এই রাত্রে হেঁটে সেখানে পৌঁছানোর কথা ভাবা বোকামি। অতএব মিথ্যে কথা বলতে হবে।

সে বেরিয়ে এল বাইরে। দূরে মহলের ঘরগুলোয় আলো জ্বলছে। ওরই একটা ঘরে সুমিত এখন এ বাড়ির বউরানীর সেবায় ব্যস্ত। শরীর গুলিয়ে উঠল ওর। তিস্তাকে দাঁড়াতে দেখে ছুটে এল দারোয়ান, 'মেমসাহাব!'

তিস্তা বলল, 'আমার একটু বাইরে যাওয়া দরকার। গাড়ি আছে?'

'হ্যাঁ মেমসাহাব। দো গাড়ি হ্যায়।'

'ড্রাইভারকে বলো গাড়ি নিয়ে আসতে।'

মিনিটখানেকের মধ্যেই একটা অ্যাম্বাসাডার সামনে এসে দাঁড়াল। তিস্তা দেখল ওই ড্রাইভারই তাদের স্টেশন থেকে এখানে এনেছিল। হঠাৎ সে বুঝতে পারল স্যুটকেস নেওয়া চলবে না। সে স্যুটকেস নিয়ে গাড়িতে উঠলেই দারোয়ান মহলে খবর দেবে। দ্বিতীয় গাড়িতে ওদের স্টেশনে পৌঁছাতে বেশী দেরী হবে না। স্যুটকেসে শাড়ি জামা রয়েছে। ওগুলোর মায়া বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। সে সোজা এগিয়ে যেতে ড্রাইভার পেছনের দরজা খুলে দিল। গাড়িতে বসে তিস্তা বলল, 'একটু নিরিবিলিতে কিছুক্ষণ ঘুরতে চাই।'

'জী মেমসাহাব।' ড্রাইভার গাড়ি চালু করল। পেছনে পড়ে রইল মহল, আলোকিত গেস্টহাউস, তার স্যুটকেস। খানিকটা যাওয়ার পর তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'এই রাস্তা কোনদিকে গিয়েছে?'

'রামগড় মেমসাহাব।'

'স্টেশনটা কোনদিকে?'

'বাঁয়া।'

'ওখানে একবার চল তো।'

গাড়ি একটু এগিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিল। তিস্তা দেখল পেছনের অন্ধকারে কোন হেডলাইটের আলো নেই। এত তাড়াতাড়ি দারোয়ান নিশ্চয়ই খবর দেবে না। তার মনেই হতে পারে মেমসাহাবদের খেয়ালের একটা হল নির্জনে ঘুরে বেড়ানো।

স্টেশনটা দেখা যাচ্ছিল। হিসেবমত আর দশ মিনিট বাকি ট্রেন আসতে। ড্রাইভারকে গাড়ি পার্ক করতে বলল তিস্তা। তারপর কোন ব্যাখ্যা না দিয়ে সে স্টেশনে ঢুকে পড়ল। টিকিট কাউন্টার খোলা। কোন যাত্রী নেই। ব্যাগ থেকে টাকা বের করে তিস্তা বলল, 'একটা কলকাতার টিকিট দিন।'

'মেইল ট্রেন আট ঘণ্টা লেট।'

'আট ঘণ্টা?' তিস্তা কেঁপে উঠল।

'হ্যাঁ। দেব?'

'এখন কোন ট্রেন নেই?'

'একটা প্যাসেঞ্জার আছে।'

'থাক।'

অসহায়ের মত প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল সে। কি করা যায়? তিস্তা মরীয়া হল। বাইরে বেরিয়ে এসে সোজা গাড়িতে উঠে জিজ্ঞাসা করল, 'ড্রাইভার, গাড়িতে কত তেল আছে?'

'তিরিশ লিটার।'

'রাঁচীতে যাওয়া যাবে?'

'রাঁচী? এখন?'

'হ্যাঁ। আমার একটা ওষুধ দরকার। খুব জরুরী।'

'ঠিক হ্যায়। লালসাহাবকো—।'

'আমার বলা আছে।' থামিয়ে দিল তিস্তা।

লোকটা বলল যে মেমসাহেবের ফিরে আসতে দেড়টা দুটো বেজে যাবে। খুব কষ্ট হবে। ওষুধটার নাম যদি লিখে দেন তাহলে সে নিজেই নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু তিস্তা বলল যে ওষুধটা একটা ইনজেকশন। সে নিজে না গেলে কোন কাজ হবে না। অতএব ড্রাইভার গাড়ি ঘোরাল

পথ যেন শেষ হচ্ছিল না। রাস্তা ভাল। কিন্তু মাঝে মাঝেই জঙ্গল পড়ছিল। দ্রুতগতিতে গাড়ি ছুটছিল। তিস্তা জানে এতক্ষণে রঙ্গলাল জেনে গেছে ব্যাপারটা। প্রথমে সে যাবে স্টেশনে। হয়তো সুমিতও সঙ্গে থাকবে। টিকিট কাউন্টারে সমস্ত ঘটনাটা ওরা শুনতে পাবে। তারপর? ওরা কি সন্দেহ করবে সে গাড়ি নিয়ে রাঁচী গেছে? খুবই স্বাভাবিক সেটা। সঙ্গে সঙ্গে রাঁচী রওনা হবে ওরা? হতে পারে? সুমিত পারবে। কেন না সে তিস্তাকে হাতছাড়া করতে চাইবে না।

সেই গাড়ি অন্তত তিরিশ চল্লিশ মিনিট পরে রওনা হয়ে তাদের ধরে ফেলতে পারে? পেছনে হেডলাইট দেখলেই বুকের ভেতর ড্রাম বাজছিল। এখন মাঝরাস্তায় নেমে পড়ার কোন উপায় নেই। ড্রাইভারটা যে রাজী হয়েছে এই ঢের। একে আর বোকা বানাতে যাওয়া বোকামি হবে।

খোলা থাকলে এদেশে বাজার আর হাসপাতালের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু এখন, রাঁচি শহরে ঢুকে, তিস্তার মনে হল সব কিছু বন্ধ হয়ে গেছে। কিছু রিক্সা ঘুরে বেড়াচ্ছে যত্রতত্র। সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, 'বড় ওষুধের দোকান জানা আছে?'

'নেহি মেমসাব।'

'স্টেশনের দিকে চল।'

স্টেশন শব্দটা উচ্চারণ করার পর নজর করেছিল লোকটার দিকে। না, তেমন কিছু সন্দেহ হয়েছে বলে মনে হল না।

সেই রাত্রে, স্টেশনে যে ট্রেন, সেটা কোথায় যাচ্ছে জানার প্রয়োজন ছিল না তিস্তার। যা কিছু ওই স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাচ্ছে তাই যেন মুক্তির পথে এগোচ্ছে এমন ভাবনা ওর মাথায় কাজ করছিল। ট্রেনটা যখন প্ল্যাটফর্ম ছাড়ল তখনও ড্রাইভার বাইরে, গাড়িতে, তখনও সুমিতরা এসে পৌঁছায়নি শহরে। খুব ধীরে চলা ট্রেনটার কামরায় বসে প্রাথমিক উত্তেজনা কমে যাওয়ার পর তিস্তা সহযাত্রীদের লক্ষ্য করল। এত কম মানুষ কেন? ট্রেন মানেই তো ভীড় উপচে পড়া। সামনে বসা এক বিহারী প্রৌঢ়কে সে জিজ্ঞাসা করল, 'এই ট্রেন

কোথায় যাবে ?'

'আমি রামগড়ে যাব।' লোকটা হিন্দীতে জবাব দিল।

হতভম্ব হয়ে গেল তিস্তা। হায় ঈশ্বর! সে কোন ট্রেনে উঠে পড়ল ? সুমিতের সঙ্গে এইরকম একটা ট্রেনে চেপে সে রঙ্গলালের স্টেশনে নেমেছিল। এত ছুটে উত্তেজনা নিয়ে এখানে এসে কি লাভ হল! আবার সে ফিরে যাচ্ছে সেই স্টেশনে। তিস্তা শরীর এলিয়ে দিল পেছনের দেওয়ালে। ভালই হল। স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকলে নির্ঘাত ধরা পড়ে যেতে হত। ওরা চিন্তাও করতে পারবে না আবার ওদের ওদিকেই সে যেতে পারে!

কিভাবে কলকাতায় ফিরে এসেছিল সেটা বড় কথা নয়, কলকাতায় ফিরে কোথায় উঠবে তাই ছিল চিন্তার বিষয়। সুমিতদের বাড়ি মানে সুমিতের অস্তিত্ব। যতই ওর মা মুখে বলুন সুমিত তাঁর ছেলে। যখন ইচ্ছে হবে সুমিত সেখানে যেতে পারে। তার পক্ষে আর সুমিতের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়। অপমান যখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকে তখন অনেক কিছু সহ্য করা যায়। সুমিত সেটাকে বাইরে টেনে নিয়ে গেছে নিজের আখের গোছানোর লোভে।

জিনিষপত্র সবই সুমিতদের বাড়িতে। সেখানে যে এর মধ্যে সুমিত পৌঁছে যায়নি তার নিশ্চয়তা কোথায় ? হাওড়া স্টেশন থেকে শেয়ালদায় চলে এল তিস্তা। তখন সে প্রায় বিধ্বস্ত। শ্যামনগরের টিকিট কেটে লোকাল ট্রেনে উঠে আঁচলটাকে ভাল করে শরীরে জড়িয়ে নিল। স্টেশন থেকে বাড়ি বেশ দূরে নয়। লাইন ধরে হেঁটে গেলে কয়েক মিনিট। কিন্তু তবু রিক্সা নিল সে। ছাউনিটাকে তুলে দিল। গঙ্গার ধারে বাবার নতুন বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ার আগেই সেটা খুলে গেল, 'আয়।'

মা দাঁড়িয়ে। তিস্তা তাকাল। চোখ সরিয়ে ভেতরে চলে যাওয়ার আগে মা বলে গেল, 'দরজাটা বন্ধ করে দে।'

'বাবা— ?'

'থানায় গিয়েছে।'

'থানা ?' চমকে উঠল তিস্তা।

'একটু আগে সুমিত এসেছিল। ঝামেলা করে গিয়েছে।'

দরজা বন্ধ করার কথা আর মাথায় রইল না। ধপ করে বাইরের ঘরের সোফায় বসে পড়ল তিস্তা। তাহলে ওরা তার আগেই এখানে পৌঁছে গিয়েছে ? কি ঝামেলা করেছে সুমিত যে বাবাকে থানায় যেতে হল।

'সঙ্গে জিনিষপত্র নেই ?' মা আবার ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে না বলল তিস্তা।

'বাথরুমে যা। স্নান কর। আমি শাড়ি জামা বের করে দিচ্ছি।' মা আবার চলে গেল। তিস্তা অবাক হচ্ছিল। মা তার কাছে কিছুই জিজ্ঞাসা করছে না। কেন এমন হল, কিভাবে সে ফিরেছে, কিছুই না। কিন্তু স্নান শব্দটা তিস্তাকে অনুপ্রাণিত করল। সে শরীরটাকে তুলল।

একটু পরে বাথরুমে দাঁড়িয়ে ওপর থেকে নেমে আসা জলের ঢল শরীরে

ছড়িয়ে বন্ধ করে কেঁপে উঠল তিস্তা। সেই অবস্থায় মাথা ঝাঁকাল সে। না। আর কখনও পেছন দিকে তাকাবে না সে। এতদিনের সব কিছু নেহাৎই ভুল। যা ভুল তা ভুলে যাওয়াই ভাল।

তার নিজস্ব পোশাক মায়ের কাছে থাকার কথা নয়। কানপুরে যখন ছিল তখন তো স্কার্ট পরত। বাবা শামনগরে বাড়ি করার পর যে কদিন এসেছে কিছু রেখে যাওয়ার কথা মনে হয়নি। এই শাড়ি যা তার শরীরে, তা মায়ের শাড়ি। জামাটাও। কিন্তু এগুলো প্রায় নতুন এবং রঙিন। মা আজকাল রঙিন কিছু ব্যবহার করে না। তাহলে কি অনেককাল আগে কেনা এবং মায়ের সঞ্চয়ে ছিল ? আজ চমৎকার কাজে লেগে গেল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে তিস্তার মনে হল তার প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে। সে আর দাঁড়াতে পারছে না। মা এককাপ চা এগিয়ে দিতে সে চুমুক দিল কিন্তু তবু বিছানা টানতে লাগল ওকে। আধকাপ খেয়ে সে মায়ের বিছানায় উপুড় হল।

ঘুম ভাঙ্গল যখন পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে গেছে। দূরে কোথাও মাইকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান হচ্ছে। একটানা ঘুমাবার পরেও মনে হচ্ছিল আরও ঘুমালে ভাল লাগত। জোর করে উঠে পড়তেই বাবাকে দেখতে পেল সে। ঘরের এক কোণে চেয়ারে বসে আছেন গালে হাত দিয়ে। তাকে উঠতে দেখে সোজা হলেন।

হঠাৎ এক ধরনের লজ্জা, ভয়, নিজের ওপর ঘেন্না মেশানো অনুভূতি আক্রমণ করল তিস্তাকে। হাঁটুতে মুখ রেখে কেঁদে উঠল সে। এবং একবার কান্না শুরু হতেই সে আবিষ্কার করল ব্যাপারটা তার নিয়ন্ত্রণে নেই। বুকের আনাচে কানাচে যেন অনেক জলের ধারা এতকাল মুখবন্ধ অবস্থায় ফুঁসছিল, আজ হঠাৎ আড়াল সরে যেতে সেগুলো যে তীব্রবেগে বেরিয়ে আসতে লাগল তাকে নিয়ন্ত্রণ করা ওর সাধ্যের বাইরে। হঠাৎ একটা চাপা ধমক কানে এল, 'তোর লজ্জা করছে না' ? তুই কাঁদছিস ? ছিঃ। ওঠ্ ! বাথরুম থেকে ঘুরে আয়। তোর বাবা না খেয়ে বসে আছে। বাইরের অপমানের জবাব বাইরে না দিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে তিনি কেঁদে চলেছেন ! আশ্চর্য !'

বুক ভারী, নিঃশ্বাসও, কিন্তু কান্নাটা বন্ধ হল। তিস্তা উঠল। বাবার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি একটাও কথা বললেন না। বাথরুম থেকে ফিরে সে দেখল বাবা খাওয়ার টেবিলে বসে গেছেন।

তিস্তা দাঁড়িয়েছিল। প্লেটে খাবার দিতে দিতে মা ডাকলেন, 'আয়।'

তিস্তা এগিয়ে এসে বাবার উল্টোদিকে বসল। তিনজন মানুষ চুপচাপ খেয়ে গেল। একটুও ইচ্ছে করছিল না, মায়ের ধমক খেয়ে গিলতে হল তিস্তাকে। খাওয়া যখন প্রায় শেষ তখন বাবা বললেন, 'কাল তোমাকে থানায় যেতে হবে। আমি ডায়েরি করেছিলাম তুমি মিসিং বলে। কেন কি অবস্থায় পড়ে তোমাকে এভাবে আসতে হল তার একটা স্টেটমেন্ট তৈরী করে কাল থানায় নিয়ে যাবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট।'

মাথা নেড়েছিল সে। বাবা শেষপর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বললেন, এই স্বস্তিতে।

মায়ের পাশে শুয়েছিল সে। শুয়েছিল কিন্তু ঘুমাতে পারছিল না। হঠাৎ

মনে হচ্ছিল পৃথিবীর কোথাও তার জন্যে একটুও ঘুম নেই। ঘরে নীল আলো জ্বলছে। মা একটা হাত ভাঁজ করে চোখের ওপর রেখেছে। তিস্তা ভেবে পাচ্ছিল না এরা কেন তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করছে না ! ব্যাপারটা যত ভাবছিল তত অস্বস্তি বাড়ছিল। সে মায়ের দিকে তাকাল। তারপর চুপচাপ বিছানা থেকে নামল।

ছেলেবেলা থেকেই সে দেখেছে বাবা এবং মা একসঙ্গে শোয় না। তখন একঘরে দুটো খাট ছিল। এখন ঘর বেশী বলেই আলাদা ঘর। তার মনে পড়ল না কখনও বাবার সঙ্গে মাকে ঝগড়া করতে শুনেছে। বাবা মাকে কখনও তার সামনে একটা কড়া কথা বলেননি। তবু মন আলাদা হয়ে থাকে কেন দুটো মানুষ তা বুঝতে পারে না তিস্তা।

বাবার ঘর অন্ধকার। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বাবার মাথার পাশে বসল সে। ওর ধারণা সত্যি হল। বাবা জেগেই ছিলেন। বাবার একটা হাত তার পিঠে উঠে এল। তিস্তা নিচু গলায় বলল, 'বাবা, আমি হেরে গেলাম।'

তাকে প্রচণ্ড অবাক করে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিসে ?'

নাড়া খেল তিস্তা। সত্যি তো, কিসে হারল সে ? কোন খেলায় ? যেটা নেহাতই একতরফা, অসম, সেই খেলায় হারজিতের কি দাম আছে ?

'তোর জন্ডিসের পরে হাসপাতালে যে প্রশ্নটা করেছিলাম সেটার উত্তর এখনও দিতে হবে না তোকে। আজ আমি অন্য প্রশ্ন করছি। তুই কি সব শেকড় তুলে এসেছিস ?'

'বাবা, বিশ্বাস কর, আমার কোন অর্থেই ওখানে শেকড় নামাবার সুযোগ হয়নি। আমার অস্তিত্বই টলমলে ছিল। এখন আমি সব ভুলতে চাই।'

'ভুলতে পারবি ?'

'হ্যাঁ।'

'সুমিত তোকে সহজে ছেড়ে দেবে না।'

'কি করবে ? জোর করে নিয়ে যেতে নিশ্চয়ই পারবে না ?'

'না। তা পারবে না। এই সুমিত তোর অচেনা ছিল, না ?'

'হ্যাঁ বাবা। বিয়ের আগে ও এরকম ছিল না।'

'ঠিকই। আমরা সবাই চিরকাল একরকম থাকি না। যা শুয়ে পড়।'

'আর ঘুম আসছে না বাবা।'

'মন থেকে ভাবনা সরিয়ে ফেল, ঘুম এসে যাবে।'

হঠাৎ কি হল, তিস্তা বাবার পাশে শুয়ে পড়ল, 'তুমি তা হলে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও, আগের মতন।'

শ্যামনগর থানার দারোগা স্টেটমেন্ট পড়লেন। তারপর বললেন, 'এসব যদি ঘটে থাকে তা হলে জল অনেকদূর গড়াবে। ভেবে দেখুন, পরে স্বামীর কাছে সারেন্ডার করবেন না তো ! এখনও সময় আছে।'

তিস্তা বলল, 'না।'

দারোগা বললেন, 'তবু ভাবতে বলছি। বাঙালি মেয়েদের তো জানি। মার খাচ্ছে, কপাল ফাটছে কিন্তু স্বামী নরম গলায় ডাকলেই ছুটে যাচ্ছে।'

'আমি সে ধরনের মানুষ নই।'

'আচ্ছা। কিন্তু মুশকিল হল আপনার অভিযোগ পেয়ে সুমিতবাবুকে আমি অ্যারেস্ট করতে পারি। কিন্তু কোর্টে আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না কিছুই। কারণ কেউ সাক্ষী দেবে না যে রঙ্গলালের কাছে সুমিতবাবু আপনাকে—। বুঝতেই পারছেন। শ্বশুরবাড়িতে যে অত্যাচার করা হত তারও কোন প্রমাণ নেই। আছে?'

হঠাৎ মঙ্গলার মুখ মনে এল। মঙ্গলা কি সাক্ষী দেবে?

'তাছাড়া ওরা অনেক কথা বলবে। আপনি কিছুদিন আগে অ্যাবরশন করিয়েছেন যখন সুমিতবাবু কলকাতায় ছিল না। যতই জোর করে ওরা করাক কোন ডাক্তার সেটা স্বীকার করবে না। আপনি অ্যাডাল্ট, নিজের ইচ্ছেয় করেছেন। কারণ সুমিতবাবুকে আপনি পছন্দ করতেন না। কোর্টে এটা আপনার বিপক্ষে যেতে পারে। বিচারকদেরও তো সেন্টিমেন্ট আছে।'

বাবা পাশে বসেছিলেন, 'তা হলে?'

'একমাত্র আপনার বাড়িতে ওর হামলা যা প্রতিবেশীরা দেখেছে তা নিয়ে কিছু করার চেষ্টা করা যেতে পারে।'

'আমি ডিভোর্স চাইছি।' তিস্তা বলল।

'চাইতে আপনি নিশ্চয়ই পারেন। কোন্ গ্রাউন্ডে?'

'অত্যাচার।'

'আবার বলছি প্রমাণ করতে পারবেন না।'

বাবা বললেন, 'সুমিত কি জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে?'

দারোগা মাথা নাড়লেন, 'না, পারে না। আর সেই চেষ্টা করলে আমি ওকে ছেড়ে দেব না, এটুকু কথা আপনাদের দিচ্ছি।'

অদ্ভুত হতাশায় আক্রান্ত হচ্ছিল তিস্তা। ফিরে আসার সময় রিকশায় বসে কথা বলতে পারছিল না। বাবা বসেছিলেন গম্ভীর মুখে। দারোগা যা বললেন সেটা যুক্তির কথা। তুমি আবেগে আক্রান্ত হয়ে কাউকে জীবনের সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতে পার কিন্তু বাস্তবের আঘাতে যদি শেষ পর্যন্ত চোখ খুলে যায় তা হলে নিজস্ব অস্তিত্ব আলাদা করতে পারবে না। আইন নামক মস্তিষ্ক-জাত সাঁড়াশির হাত একটুও আলগা হবে না যতক্ষণ তুমি স্বপক্ষে প্রমাণ হাজির করতে পারছ।

তিস্তা মাথা নাড়ল। এসবে কি এসে যায়। সুমিত তার কাছে মৃত। একটি মৃত মানুষকে নিয়ে এত ভাবনা ভাবার কোন দরকার নেই।

অথচ ভাবতে হল। পরদিন সকালে সুমিত এল একটা অ্যাম্বাসাডারে চেপে। সঙ্গে আরও তিনজন লোক। তারা গাড়ি থেকে নামল না অবশ্য। বাবাই দরজা খুলেছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি চাই?'

সুমিত হেসেছিল, 'আচ্ছা! শুনুন, যা হবার তা হয়ে গেছে। মানুষমাত্রই ভুল কাজ করতে পারে, হয়তো আমিও করেছি।'

বাবা মাথা নেড়েছিলেন, 'আমি কোন কথা শুনতে চাই না। তুমি আমার বাড়িতে কখনও আসবে না।'

'আশ্চর্য! আমার স্ত্রী আপনার বাড়িতে থাকলে আমাকে আসতেই হবে।

কথাবার্তা একটু স্বাভাবিকভাবে বলুন !' শেষের দিকে সুমিতের গলায় তরল সুর।

তিস্তা ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল। লোকটা কি চায় সে বোঝার চেষ্টা করছিল। বাবা না ডাকলে ভেতরে যাবে কিনা বুঝতে পারছিল না। সুমিতের সামনে দাঁড়াতে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে করছিল না। এত কাণ্ডের পরে কেন এল ও ? কিন্তু তখনই তার পাশ দিয়ে মা ঘরে ঢুকল, 'ওকে ভেতরে এসে বসতে বল। যা বলার ভদ্রভাবে বলুক।' কথা শেষ করেই মা আবার গম্ভীর মুখে ভেতরে চলে গেল। বাবা দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন।

সুমিত ভেতরে ঢুকে সোফায় বসল, 'আপনার মেয়েকে ডাকুন।'

'কেন ?'

'বাঃ, আমি এসেছি, আমার সঙ্গে ওকে যেতে হবে।'

'না, সে যাবে না।'

'আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই। সে আমার স্ত্রী। আপনি কেন খামোখা আমাদের মধ্যে আসছেন ? যান, ডাকুন।'

তিস্তা আর পারল না। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে বলল, 'কি চাও ?'

'তোমাকে।'

যেন চাবুকের আঘাত পড়ল সারা শরীরে, চোখ কুঁচকে উঠল উত্তরটা শুনে। সুমিত বলল, 'মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে। লালের কথাবার্তা ঠিক নেই। কি বলতে কি বলেছে। চল, ফিরে যাবে।'

'শোন সুমিত। আমি তোমাকে ঘেন্না করি। তোমার সঙ্গে আর আমার থাকা সম্ভব নয়। তুমি তোমার কাজ কর, আমাকে বিরক্ত করো না।' তিস্তা স্পষ্ট বলল।

'তুমি আমাকে ঘেন্না করো ?'

'হ্যাঁ।'

'কারণটা জানতে পারি ?'

'তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছ ? নিজে জানো না।'

'না।'

'আমি তোমাকে কোন ব্যাখ্যা দেব না।'

'আমি জানি না তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি কিন্তু আমাকে না বলে সন্ধেবেলায় লালের মহল থেকে বেরিয়ে কার সঙ্গে বাইরে রাত কাটিয়েছ তা নিয়ে কিন্তু আমি কোন প্রশ্ন তুলছি না। আমি বলছি, সব ভুলে যাও, ফিরে চল।'

'তুমি এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।'

'রাগ করছ !'

'বেরিয়ে যাও।' চিৎকার করল তিস্তা।

'চেঁচাচ্ছ কেন ? আমি তো বেরিয়ে যেতে আসিনি।'

'আমি পাড়ার লোক ডাকব।'

'কোন লাভ হবে না। আমার সঙ্গে যে তিনজন এসেছে তারা ওদের দাঁড়াতে দেবে না। শোন, আমি লালকে কথা দিয়ে এসেছি, তোমাকে আমার

সঙ্গে ফিরে যেতে হবে। নইলে ম্যাডাম ফিরে এসব জানতে পারলে ঝামেলা করবেন।'

তিস্তা ঘুরে দাঁড়াল, 'বাবা, তুমি এখনই থানায় যাও। অফিসার কথা দিয়েছেন প্রটেকশন দেবেন।'

'বাঃ। এর মধ্যে থানায় যাওয়া হয়েছিল নাকি ? কোন্ অফিসার ? গাড়িতে বসা ছেলেরা একবার থানায় গেলে লোকটাকে আর চিনতে পারবে না তা জানো ? থানা দেখাচ্ছে !' সুমিত উঠে এগিয়ে এল, 'চল !'

'খবরদার সামনে আসবে না।'

'কি করবে ? খুন করবে নাকি ?' সুমিত হাসল।

'সেটা করলে বেশী মর্যাদা দেওয়া হবে।'

'আচ্ছা ! তিস্তা। আমার চাকরির জন্যে তোমাকে আমার দরকার। এটা একটা সহজ সত্যি কথা। কিন্তু যদি না পাই তা হলে আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না। তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত অ্যাসিডে পুড়িয়ে দেব। তারপরও বাঁচলে বাঁচবে, মরলে মরবে। আমি তোমাকে সাতদিন সময় দিলাম।' আচমকা ঘুরে বেরিয়ে গেল সুমিত। গাড়ি চালু হবার আওয়াজ হল। শব্দটা মিলিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিল তিস্তা। তার চোখের সামনে দিয়ে বাবা বেরিয়ে গেলেন। মা এল পাশে, 'তোর বাবা কোথায় গেল ?'

নীরবে জানি না বলল তিস্তা।

'ওর এই স্বভাবের কথা তুই জানতিস না ?'

চোখ বন্ধ করল তিস্তা। তারপর চোখের জল চাপতেই ঘন ঘন মাথা নাড়ল।

'তোর কিছুদিন এখানে থাকা উচিত নয়।'

'মানে?'

'সুমিত যা বলল তাই করবে।'

'কি বলছ তুমি ? এটা কি মগের মুলুক।'

'আজ যদি ওর সঙ্গীরা ঘরে ঢুকে তোর ওপর অত্যাচার করত কি করতে পারতাম আমরা। চেঁচাতাম। লোক জড়ো হত। কিন্তু যদি ওরা গুণ্ডা হয় তা হলে ঠিক ফিরে যেত।'

'তাই হলে তাই হোক। আমি কোথাও যাব না।'

'বোকার মতো কথা বলিস না। সব সময় জেদ ধরে থাকলে চলে না। তোকে যদি ডিভোর্স পেতে হয় তা হলে বুদ্ধি খাটাতে হবে।'

'কি করে ?'

'তোর মাসিমার দেওর খবরের কাগজে কাজ করে। খুব নামকরা রিপোর্টার। তুই তো যাস না, তা জানিস না। এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে ওরাই। ওর কাছে যেতে হবে আমাদের।' মা বলল।

'তুমি যাবে ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ভদ্রলোক কি করতে পারেন ?'

'কলকাতা শহরে তোর বাবার বেশি চেনা মানুষ নেই। পরামর্শ নেবার জন্যে কার কাছে যাওয়া দরকার তাও জানা নেই। মাস্তর দেওর হয়তো সেটা দিতে পারবে।'

বাবা থানা থেকে ফিরে এসেছিলেন গম্ভীরমুখ নিয়ে। দারোগা তাঁকে বলেছেন চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশ পোস্টিং দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সুমিত আসামাত্র যদি তাঁকে জানানো হয় তা হলে তিনি ব্যবস্থা নিতে পারেন। ভদ্রলোকের কথায় আজ একটুও আশার আলো দেখতে পাননি বাবা।

মায়ের প্রস্তাব শুনে বাবা প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, 'ওকে নিয়ে যেও না।'

'কেন?'

'বলা যায় না কিছু। যেটা বাড়ি বয়ে এসে বলে গেল রাস্তায় পেলে যদি সেটাই করে ফেলে! আমার আর কিছু ভাল লাগছে না। দেশটা কোথায় গেল।'

মা বলল, 'যাওয়ার সময় তো সময় দিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া নিশ্চয়ই সব জায়গায় ওঁত পেতে বসে নেই।'

বাবাকে সঙ্গে নেওয়া হল না। বাবা যেন আর টেনশন সহ্য করতে পারছিলেন না। দুপুরে মাকে নিয়ে তিস্তা বের হল। বাইরে পা দিয়েই তার অদ্ভুত অস্বস্তি হচ্ছিল। যে কোন মুহূর্তে কেউ তাকে আক্রমণ করতে পারে, ক্ষতি করতে পারে এমন একটা ভয় প্রবল হচ্ছিল। শেয়ালদায় নেমে ওরা ট্যাক্সি নিল। বারংবার পেছনে তাকিয়ে সে নিঃসন্দেহ হল সুমিত বা কেউ তাদের অনুসরণ করছে না। ধর্মতলায় খবরের কাগজের অফিসের চারতলায় উঠে মাসীর দেওরকে দেখে সে বেশ হতাশ হল। একটা বড় হলঘরে অনেক কর্মীর সঙ্গে বসেছিলেন তিনি। চেহারাও সাধারণ। পরিচয় দিতে হল মাকে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'ছি ছি আপনি কষ্ট করে কেন এলেন! কি অবস্থা দেখুন, আপনি বউদির দিদি অথচ আমাদের মধ্যে কোন যোগাযোগই নেই।'

মা বললেন, 'চিরকাল বাইরে থেকেছি, সেটাই কারণ।'

ভদ্রলোকের নাম সুখেন্দু রায়। ওদের নিয়ে এলেন একটি নির্জন ঘরে। বললেন, 'সমস্যা কি বলুন।'

মা সব কথা পরিষ্কার বলে গেলেন। ভদ্রলোক একটা কাগজে নোট করে যাচ্ছিলেন। তিস্তার মনে হল সাংবাদিক হিসেবে উনি ওই অভ্যেসটা রপ্ত করেছেন। মায়ের কথা শেষ হবার পর সুখেন্দু তিস্তাকে কিছু প্রশ্ন করলেন। রঙ্গলাল এবং তার ব্যবসা ছাড়াও সুমিতের বাড়ির কথা জানতে চাইলেন। তারপর অপারেটারকে একটা নাম্বার দিতে বললেন। উল্টো দিকের মানুষটির সাড়া পেলে প্রথমে সামান্য খোশগল্প করে বললেন, 'একটা উপকার করতে হবে। আমার এক আত্মীয়া তার স্বামীর অত্যাচারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। ও এখন আছে শ্যামনগরের বাপের বাড়িতে। আমি আপনাকে নাম-ঠিকানা দিচ্ছি, আপনি শ্যামনগর পি এস-কে যদি একটু বলে দেন ওদের প্রটেক্ট করতে। হ্যাঁ, ওখানে গিয়ে হুমকি দিয়ে এসেছে।

কলকাতায়। মানিকতলার কাছে। হ্যাঁ আমি ডি সি নর্থকে বলছি। হ্যাঁ, নাম-ঠিকানা লিখে নিন।' সুখেন্দু টেলিফোনে সব জানিয়ে দিয়ে রিসিভার রাখল।

মা জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা এখন কি করব?'

'কি চান আপনারা?'

'কি করা সম্ভব?'

'সুমিতকে পুলিশ থানায় এনে শাসিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তাতে কোন কাজ হবে না। তবে এখন আপনারা কদিন শ্যামনগর পুলিশের সাহায্য পাবেন। তুমি কি করতে চাও বল?' এবারের প্রশ্নটা তিস্তাকে।

'ডিভোর্স।'

'দ্যাটস নট ভেরি ইজি থিং, যদি ও কনটেস্ট করে। আমার মনে হয় সেটা ও করবেই। এদেশে অপরাধীরাও আইনের ফাঁককে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে মাথা তুলে ঘুরে বেড়াতে পারে। সোজা পথে তাই কাজ হবে না। আপনাদের ভাল উকিল জানা আছে?'

'না।'

'বেশ। আমি একজনের কাছে আপনাদের পাঠাচ্ছি। ভদ্রলোক খুব সাহায্য করবেন। কেসের কাগজ জমা হয়ে গেলে তোমাকে কিছুদিনের জন্যে কলকাতা মানে শ্যামনগর ছাড়তে হবে।'

'কেন?' তিস্তা জানতে চাইল।

'মরীয়া হয়ে গেলে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। তখন সে কি করবে তুমি জান না।'

'কিন্তু আমি কোথায় যাব?'

'মাস্তুর কাছে চলে যা।' মা বলল।

'বাঃ। ভাল। দাদা বউদির শান্তিনিকেতনের বাড়ি একদম খালি। খুব খুশী হবে তোমাকে দেখে। তাছাড়া কলকাতার কাছাকাছি থাকা ভাল, কখন প্রয়োজন হবে কে বলতে পারে। দিদি, আপনি চিন্তা করবেন না। ডিভোর্সে ও যাতে কনটেস্ট না করে আমি চেষ্টা করব।' সুখেন্দু একটা কাগজে উকিলের নাম-ঠিকানা লিখে দিল।

মা বলল, 'যে ছেলে নিজের বাপ মা বউ-এর কথা শোনে না তাকে কি রাজি করানো যাবে? আমার বিশ্বাস হয় না।'

সুখেন্দু বলল, 'ঠিকই। তবে এমন কেউ কেউ আছে যার কথা না শুনলে ও চোখে সরষের ফুল দেখবে। জলে বাস করে কেউ কুমিরের সঙ্গে মারপিট করতে যায় না। ওর কুমিরটি নানান কারণে আমাকে খাতির করেন। তাঁকে বলব।'

তিস্তা অবাক, 'কুমির মানে?'

'পলিটিক্যাল লিডার।' সুখেন্দু জবাব দিয়েছিল।

অদ্ভুতভাবে সব পাল্টে গেল। শান্তিনিকেতনে তিস্তা ছিল মাস দেড়েক। সেই সময় মাসির অনেক অনুরোধেও বাড়ি থেকে বের হত না। বই নিয়ে বসে

থাকত প্রায় সবটা সময়। তারপর খবর এল সুমিত রাজি হয়েছে ডিভোর্সের জন্যে যৌথ আবেদনে সই করতে। সে কোন ক্ষতিপূরণ করবে না এবং বাধাও দেবে না ডিভোর্স কার্যকরী হতে। বিশ্বাস করতে যতই অসুবিধে হোক ব্যাপারটা ঘটে গেল। অবশ্য তদ্দিনে কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছে তিস্তা। এ সবই সম্ভব হল সুখেন্দুর জন্যে। এক বিশেষ রাজনৈতিক নেতার ছেলেরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল সুমিতকে। নেতা তাকে বলে দিয়েছিলেন কি করতে হবে। না করলে কি হবে তাও জানিয়েছিলেন। সুমিত আর বোকামি করেনি।

তিস্তা মাঝে মাঝে একটা কথা ভেবে অবাক হয়। এই যে এত কাণ্ড হল, আদালতে বারংবার যেতে হল কিন্তু তার শাশুড়িঠাকুরুণ একবারও দেখা দিলেন না। তিনি ইচ্ছে করলে স্বচ্ছন্দে যোগাযোগ করতে পারতেন। নিজে না পারুন, মঙ্গলাকে পাঠাতে অসুবিধে ছিল না। কিন্তু তিনি এ সব কিছুই করেননি। এই যে অদ্ভুত নির্লিপ্ত হয়ে থাকা, এর কারণ কি ? তাঁর ব্যবহারে মাঝে মাঝে অনেক নির্মম ব্যাপার দেখলেও তিস্তার সঙ্গে ভাল ব্যবহারও করেছেন। তাই ছেলে অন্যায় করছে জানলে তাঁর তো আরও সক্রিয় হবার কথা। নাকি বড়ছেলেকে তিনি পছন্দ করতেন না এটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। যখনই সেটা পারিবারিক সম্মানের মুখোমুখি হল তখনই তিনি পুত্রকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করবেন ? এছাড়া ওঁর ব্যবহারের কোন ব্যাখ্যা তিস্তার মনে এল না।

জীবনটা অদ্ভুত হাল্কা হয়ে গেল তিস্তার। যে ঝড় এই কয়েক বছরে তার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে তা থেমে যাওয়ার পর অদ্ভুত শান্ত যেন চারধার। প্রেম ভালবাসা সম্পর্কে বই-এর পাতায় ছড়ানো ব্যাখ্যাগুলোর কথা ভাবলে নিঃশ্বাসে কষ্ট জমে। রবীন্দ্রনাথের গান শুনলে বুক ভার হয়। যা স্বাভাবিক এবং সত্যি তা কি রকম করে ওর জন্যে মিথ্যে হয়ে গেল।

এবার সে মুক্তনারী। মুক্তি মানে আরও বেশি দায়িত্ব। এই কয়েক মাস অথবা বছরের টানাপোড়েনে তিস্তার আয়ের উৎসগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। নতুন করে টিউশুনি হয়তো খোঁজা যায় কিন্তু তাতে সে উৎসাহ পাচ্ছিল না। একটি ভদ্রগোছের চাকরি চাই। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কার্ড করা, কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত পাঠানোর প্রচলিত পদ্ধতিগুলো যে শুধুমাত্র হতাশা বাড়ায় তা আর একবার প্রমাণিত হল। স্কুলের মাস্টারি থেকে সাবান কোম্পানির বিক্রেতা, কোন চাকরির জন্যেই সে পিছুপা হয়নি। ইন্টারভিউ পেয়েছিল গোটাদুয়েক। একটা বিক্রেতা নেবে কমিশনে, আর একটা সওদাগরী অফিসের কেরানি। দু জায়গায় শেষ প্রশ্ন, 'আপনি ডিভোর্সী ?'

'হ্যাঁ।'

কে করল ? আপনি না তিনি ?'

'কেন বলুন তো ?'

'ব্যাপারটা জানা দরকার।'

'আমি বুঝতে পারছি না, এই চাকরির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক !'

'আপনি একটা ঘর বাঁচাতে পারেননি, চাকরি বাঁচাতে পারবেন কিনা সেটা

জানতে চাইব না ?' দু জায়গায় শব্দগুলো একটু অদলবদল হয়ে উচ্চারিত হয়েছিল।

কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় যাওয়া বন্ধ। বাড়িতে বসে থাকলে কেউ চাকরি দেবে না। তিস্তা রোজ কলকাতায় আসে। কিছু না থাক ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি আছে। একদিন সে লাইব্রেরির সামনে পৌঁছতেই একটা দামী গাড়ি পাশে এসে দাঁড়াল, 'আমরা কি দোষ করেছি সেটা বুঝতে পারছি না।'

চমকে তাকিয়ে তিস্তা অবাক হল, 'আরে আপনি ?'

'হ্যাঁ, আমি। কিন্তু ভাই তুমি না বলে চলে এলে কেন ?'

'আই অ্যাম সরি। হঠাৎ জীবনে এমন ঝড় উঠল যে, সব টালমাটাল হয়ে গিয়েছিল। পরে ভেবেছিলাম কিন্তু— ! ভাবীজি কেমন আছেন ?'

'ভাল। বাচ্চারাও ভাল। এখানে ?'

'সময় কাটাতে। চাকরি খুঁজছি।'

'তাই নাকি ?' শাওনরাম চোখ বন্ধ করলেন, 'গ্র্যাজুয়েশন হয়নি ?'

'হ্যাঁ। হয়েছে।'

'এসো। আমাকে একটু জলদি বাড়ি ফিরতে হবে। তুমি আমার সঙ্গে গেলে গাড়িতে বসে কথা হবে।' ভদ্রলোক পাশের দরজা খুলে দিলেন।

একটু দ্বিধা মনে এল না। লাইব্রেরিতে তার জরুরী কাজও ছিল না। গাড়ি চালাতে চালাতে শাওনরামজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় আছ ?'

'শ্যামনগরে। বাবার কাছে।'

'হাউ অ্যাবাউট ইওর হাসব্যান্ড ?'

'আমরা ডিভোর্সড।'

শাওনরামজী তাকালেন কিন্তু কিছু বললেন না।

'মেয়েদের নিশ্চয়ই কেউ পড়াচ্ছে ?'

'হ্যাঁ। তবে তোমার ভাবীজির আর ইংরেজি শেখা হল না। তিস্তা, তুমি কি ধরনের চাকরি খুঁজছ ?'

'যে কোন ভদ্র চাকরি।'

'ভদ্র ? দ্যাখো, আমি তোমাকে আমার কোম্পানিতে নিতে পারতাম। কিন্তু সেটা নেওয়া ঠিক হবে না। অন্যায় করব।'

'কেন ?' তিস্তা অবাক।

'তোমার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হবে।'

'কেন ?' আরও জোরে উচ্চারণ করল তিস্তা।

'প্রথমত কাজে ভুল হলে তোমাকে কড়া কথা বলতে আমার অসুবিধে হবে যা অন্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে হবে না। দ্বিতীয়ত তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে অফিসে আছে অথচ তাকে কোনভাবে ব্যবহার করছি না এটা আমার বন্ধুরা মানতে চাইবে না। লোকে যাকে খারাপ লোক বলে আমি প্রায় তাই। সব গুণ আমার মধ্যে আছে।' শাওনরাম বললেন।

'আপনি আজেবাজে কথা বলছেন।'

'না। তোমার ভাবীজিকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। ওয়েল, আমি তোমাকে একটা ভাল জায়গায় পাঠাব। এম. ডির বয়স আশি। ওর ছেলে সবে কলেজ

থেকে বেরিয়েছে। মনে হয় সেফ থাকবে।

সেদিন শাওনরামজী ওকে সোজা থিয়েটার রোডের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভাবীজি খুব খুশি। পেট ভরে খাইয়েছিলেন। সে যখন ভাবীজির সঙ্গে গল্প করছে তখন শাওনরামজী আবার বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার আগে একটা ঠিকানা দিয়ে বললেন, 'তুমি এখনই দেখা কর। গুড লাক।'

অফিসটা ক্যামাক স্ট্রিটে। ভাবীজির বাড়ি থেকে দূরে নয়। আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিস্তা ক্যামাক স্ট্রিটে এল। দশতলা বাড়ির চারতলায় অফিস। ঢোকার আগেই বাহার দেখে তিস্তা বুঝল কোম্পানির অবস্থা বেশ ভাল। স্লিপ দিয়ে মিনিট পনের অপেক্ষা করার পর জুনিয়রের সামনে সে পৌঁছতে পারল। তিস্তার মনে হল ছেলেটি তারচেয়ে বয়সে ছোট। ঠাণ্ডা ঘরে বসে ছেলেটি প্রশ্ন করল, 'এনি এক্সপেরিয়েন্স ?'

তিস্তা মাথা নাড়ল, না নেই।

'গ্র্যাজুয়েট ?'

'হ্যাঁ।'

কোন্ কলেজ ?'

'প্রেসিডেন্সি।'

'আই সি। আমরা ট্রান্সপোর্ট বিজনেসে আছি। প্রচুর ঝামেলা। আমার বাবার বয়স না হলে আমি নিজেই এসবের মধ্যে ঢুকতাম না। ছয় মাসে কিস্যু বুঝিনি। গোয়েঙ্কা কলেজে আছি এখনও। আপনার বুঝতে কতদিন লাগবে ?'

'কি রকম কাজ সেটা না জেনে বলব কি করে ?'

'বললাম তো বহুৎ ঝামেলার কাজ।' ছেলেটা একটা সিগারেট ধরালো। ওকে বেশ বেমানান লাগছিল। ধোঁয়া ছেড়ে ছেলেটি বলল, 'বাবা একটু আগে বললেন আপনি আসছেন। কত মাইনে চান ?'

'আমি যে পোস্টে কাজ করব তার নিশ্চয়ই একটা স্কেল আছে।'

'না নেই। ওসব এখানে নেই। আমরা যাকে যেমন খুশি তেমন মাইনে দিই। আপনি জয়েন করলে এই অফিসে সেকেন্ড মেয়ে হবেন। কত হলে চলে ?'

এই সময় ইন্টারকমে আওয়াজ উঠল। তড়িঘড়ি অ্যাসট্রেতে সিগারেট চেপে ছেলেটি রিসিভার তুলল, 'জী ! হ্যাঁ। নিয়ে আসছি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল ছেলেটি, 'চলুন, বাবা এখন ফ্রি আছেন। শুনুন, বাবার মুখের ওপর একটা কথাও বলবেন না।'

সিনিয়ারের ঘরের দরজায় সোনালি ধাতুতে লেখা এম ডি। অফিসটা বেশ বড়। অন্তত জনা সত্তর মানুষ কাজ করছেন। টেলিফোন অপারেটার মহিলা ওর দিকে তাকালেন। এরা কি জেনে গেছে সে কেন এসেছে ?

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই বৃদ্ধকে দেখতে পেল তিস্তা। বাঁ পা ভাঁজ করে চেয়ারের ওপর তোলা। খুব রোগা। পাকা চুল এবং পাকা গোঁফ অদ্ভুত কম্বিনেশন তৈরি করেছে।

সিনিয়ার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন কথা বলেছ ?'

জুনিয়ার মাথা নাড়ল, 'না।'

'তা হলে কি করছিলে এতক্ষণ ?' খেঁকিয়ে উঠলেন সিনিয়ার। তারপর তিস্তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি নাম তোমার ?'

তিস্তা নাম বলল। সিনিয়ারের সেটা পছন্দ হল বলে মনে হল না।

'শাওন তোমাকে পাঠিয়েছে। গ্র্যাজুয়েট। ঠিক আছে। তুমি একটা দরখাস্ত লেখ। আমার কোম্পানিতে জুনিয়ার একজিকিউটিভ হিসেবে জয়েন করতে চাও। হ্যাঁ, চটপট এখানে বসেই লিখে ফেল।' সিনিয়ার একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন।

সঙ্কোচ না করে লিখে ফেলল তিস্তা। লিখে এগিয়ে দিল। সিনিয়ার সেটা পড়লেন। মাথা নাড়লেন, 'গুড। কোন ভুল নেই।'

জুনিয়ার দাঁড়িয়েছিল, বলল, 'প্রেসিডেন্সির স্টুডেন্ট।'

'তুমি জানলে কি করে ?' সিনিয়ার তাকালেন।

'ওইটুকুই জিজ্ঞাসা করেছিলাম।' বিড়বিড় করল জুনিয়ার।

সিনিয়ার রুমালে নাক ঝাড়লেন। সর্দির ধাত আছে বোধহয়। তারপর বললেন, 'তুমি একুশশো পাবে। নো ডি.এ অর এনিথিং। যেমন কাজ করবে তেমন ইনক্রিমেন্ট হবে। তোমার কাজ হবে সমস্ত করেসপনডেন্স আপ-টু-ডেট রাখা। ওকে কোণের ঘরটা দেখিয়ে দাও।'

তিস্তার জীবনে প্রথম চাকরি। ওই ঘরে আরও তিনজন বসেন। তিনজনের বয়সই পঞ্চাশের কাছাকাছি। দু দিনেই তার টেবিলে ফাইলের পাহাড়। জবাব লিখতে তাকে প্রায় সিনিয়ারের ঘরে যেতে হচ্ছে। কোম্পানি কাকে কিরকম জবাব দিতে চায় তা তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সিনিয়ার যতই বিশ্রী মেজাজের মানুষ হন না কেন কাজের ব্যাপারে খুব সিরিয়াস। কোন্ পার্টি কেমন সেই বুঝে তাকে কি লিখতে হবে তার রীতিনীতি কয়েকদিন বলে দেবার পর তিস্তার নিজেরই আন্দাজ হয়ে গেল। এখন নেহাত আটকে না পড়লে তিস্তাকে সিনিয়ারের ঘরে যেতে হয় না। অফিসটা খারাপ নয়। কর্মচারীরা বেশ নিরীহ। ক্রমশ সে জানতে পারল কর্মচারীদের মধ্যে মাত্র চারজন দু হাজারের ওপর মাইনে পায়। অথচ লোকগুলো কাজ করে মাথাগুঁজে, কোথাও কোন প্রতিবাদ নেই।

একুশশো টাকা তিস্তার কাছে অনেক টাকা। শ্যামনগর থেকে পৌনে আটটায় বেরিয়ে আবার রাত সাড়ে সাতটায় ওই টাকার জন্যে বাড়ি ফেরা যায়। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে তিস্তা থিয়েটার রোডে গিয়েছিল। শাওনজী, ভাবী, মেয়েদের জন্যে টুকটাক উপহার নিয়ে গিয়েছিল। ভদ্রমহিলা খুব খুশি। বললেন, 'তোমার দাদা লোকটা অদ্ভুত। আমি আজও বুঝতে পারলাম না।'

'কেন ?' তিস্তা হাসল।

'প্রায় তোমার কথা বলে। কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা ভাবে। তোমাকে ও ঠিক বোনের মতো মনে করে। অথচ মেয়েদের সম্পর্কে ওর আসক্তি তুলনাহীন। ওর একটা অ্যালবাম আছে। আজ পর্যন্ত যত মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

হয়েছে তাদের প্রত্যেকের ছবি আছে সেখানে। ভাবতে পার ?'

'যাঃ। আমি বিশ্বাস করি না।' জোর দিয়ে বলল তিস্তা।

'আমার বড় মেয়ে একদিন অ্যালবামটা দেখে ফেলেছিল। অত মেয়ের ছবি দেখে সে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ওরা কারা। তোমার দাদা জবাব দিয়েছিল, এদের মধ্যে যে কেউ তোমার নতুন মা হতে পারত। হয়নি।'

'আমি ভাবতে পারছি না ভাবীজি।'

'কিন্তু তোমার ওপর ওর একদম অন্যরকম ধারণা। মেয়েদের বলে তিস্তা আন্টিকে দেখে শেখ। কিভাবে নিজে লড়াই করে যাচ্ছে।'

শাওনরামজীর কথা সেদিন বাড়ি ফেরার সময় বেশ কিছুক্ষণ ভেবেছিল সে। মানুষটা সত্যি অদ্ভুত। আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে এমন কোন ব্যবহার করেনি যে, মনে খারাপ চিন্তা আসে। তার কাছে যে সত্যিকারের ভদ্রলোক হয়ে থাকে সেই মানুষের জীবনে ভাবীর কথানুযায়ী এমন নারীর পর নারী আসে কি করে ? এত মানুষের সঙ্গে একের পর এক ঘনিষ্ঠতা করা যায় ?

তিন মাস চাকরির পর ঘটনাটা ঘটল। তিস্তা গম্ভীর, কাজের মানুষ, ব্যক্তিত্ব আছে এমন একটা ধারণা অফিসে চালু থাকায় ওর সুবিধেই হয়েছিল। শুধু মাঝে মাঝে জুনিয়ার তাকে ডেকে পাঠায় যখন সিনিয়ার অফিসে থাকেন না। ছেলেটার বয়স কম বলে মনে প্যাঁচ জমেনি তেমনভাবে। সিগারেট খেতে খেতে বলে, 'একা চা খাচ্ছিলাম তাই আপনাকে ডাকলাম। নিন, খান।'

'আমি একটু আগে চা খেয়েছি।'

'দূর। ওটাতো পাবলিকের চা। মুখে দেওয়া যায় না। এটা মকাইবাড়ির পাতা। খেয়ে দেখুন। কেমন লাগছে অফিস ?'

'ভাল।'

'হ্যাঁ। বাবা আপনার কাজে খুব স্যাটিসফায়েড। আমার বাবাকে কি মনে হয় আপনার ? রাবণের কটা মাথা ছিল ? দশটা না ? আমার বাবার একশটা। দশ ডবল রাবণ। সব জায়গায় চোখ আছে।'

মোটামুটি এই ধরনের কথাবার্তা হয়। নির্দোষ। কিন্তু এক দুপুরে সিনিয়ার অফিসে থাকা সত্ত্বেও জুনিয়ার তিস্তাকে ডেকে পাঠাল। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে তিস্তা দেখল ছেলেটা সাদা রুমালে ঘাড় মুছছে।

'বলুন ?'

'আমি একটা প্রবলেমে পড়ে গেছি। আপনি আমাকে হেলপ করবেন ?'

'বলুন।'

'দুজনের একটা ফরাসী টিম আসছে কলকাতায়। যাদের সঙ্গে আমাদের ভাল ব্যবসা আছে। আপনি তো জানেন !'

'হ্যাঁ জানি। ওঁরা আজ সন্ধ্যায় কলকাতায় আসছেন।'

'হ্যাঁ। ওঁদের জন্যে দুজন এসকর্ট ঠিক করে দিতে হবে।'

'এসকর্ট ?'

'হ্যাঁ। গাইড নয়। ওরা তো বেড়াতে আসছে না যে, গাইড দরকার। দে নিড এসকর্ট ফর টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স। আমাদের এক কন্ট্রাক্ট আছে। কিন্তু গতবার ডেনমার্ক থেকে যে দলটা এসেছিল তাদের জন্যে লোকটা যাদের

পাঠিয়েছিল তারা খুব সাবস্ট্যান্ডার্ড। যাওয়ার সময় সেটা বলে গিয়েছিল ওরা। তাই বাবা চান আগে থেকে সিলেকশন করে রাখা।'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'ওঃ। ইটস সো সিম্পল। আপনাকে গাড়ি দিচ্ছি। এই মেয়েগুলো পার্ক স্ট্রিটের একটা বাড়িতে তিনটের সময় অপেক্ষা করবে। আপনি তাদের মধ্যে থেকে দুজনকে সিলেক্ট করবেন যাদের ফরাসীরা পছন্দ করবে। আন্ডারস্ট্যাণ্ডিং। দিস ইজ পার্ট অফ দি বিজনেস।'

'এসব করার জন্যে আমাকে চাকরি দেওয়া হয়নি।'

'আই নো, আই নো। ইটস এ রিকোয়েস্ট।'

'আপনি যাচ্ছেন না কেন?'

'কারণ আছে। তাছাড়া আপনি একজন মহিলা হিসেবে যেমন বুঝবেন সেটা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।'

'আপনার বাবা জানেন যে আপনি আমাকে ওই প্রস্তাব দিচ্ছেন?'

'ও সিওর। উনি বলেছেন কাজটি করতে হবে। কিভাবে করছ তা তোমার হেডেক। আমি শুধু রেজাল্ট দেখতে চাই।' জুনিয়ারের কথা শেষ হওয়া মাত্র উঠে দাঁড়াল তিস্তা। হনহন করে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে সিনিয়ারের দরজায় পৌঁছে বেয়ারার বাধা পেল, 'মালিক বিশ্রাম করছেন।'

'বল, খুব জরুরী।'

ঘরে ঢোকার অনুমতি পেলে তিস্তা সিনিয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লম্বা বেতের ইজিচেয়ারে বৃদ্ধ শুয়েছিলেন, 'ইয়েস।'

'আমার পক্ষে এখানে আর চাকরি করা সম্ভব নয়।'

'কারণ?'

'আপনারা আমাকে যে কাজটা করতে বলেছেন সেটা—।'

'তোমাকে বলা হয়েছে সিলেকশন করতে সাহায্য করতে?'

'হ্যাঁ!'

'দুজনকে?'

'হ্যাঁ।'

'দুজন বিদেশির জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে তোমাকে বলা হয়নি ওদের এনটারটেইন করতে। বলা হয়নি কারণ তুমি শাওনরামের ক্যান্ডিডেট। অন্যকোন অফিস হলে একজন প্রফেসনাল এসকর্টের টাকা বাঁচিয়ে তোমাকে পাঠাত। বুঝতে পারছ? তোমাকে সম্মান দেওয়া হয়েছে অথচ তুমি বুঝতে পারছ না।'

'আমি একটু কম বুঝি। তাই আমার পক্ষে এরপরে এখানে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। আমি কি যেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। তবে তার আগে তোমাকে একটা দরখাস্ত লিখতে হবে।'

'দরখাস্ত?'

'রেজিগনেশনের।'

মিনিট পনের পরে ক্যামাক স্ট্রিটের রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলল সে।

চাকরিটা গেল। একুশশো টাকায় বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সে। শাওনজী নিশ্চয় এর মধ্যে সিনিয়ারের কাছ থেকে খবর পেয়ে গেছেন। হয়তো ওর ওপর রেগে যেতে পারেন। কিছু করার নেই তার। হঠাৎ মনে হল রঙ্গলাল কিংবা সুমিত এখন সব জায়গায় সক্রিয়। কিন্তু যেদিন কোন নারীতে পুরুষের মন ভরবে না, যেদিন নারীমাংস সরবরাহ করে যখন ধান্দাবাজের লাভ হবে না সেদিন কিভাবে এরা বেঁচে থাকবে ? দেড়শো জন্ম ধরে মানুষ যে কাজটা করে যাচ্ছে তার পূর্ণচ্ছেদে আর কত দেরি ? সব কিছুর মতো এ ব্যাপারে একঘেঁয়েমি আসে না কেন ?

দিনগুলো চলে যাচ্ছিল দিনের মত। চাকরি যে কারণে ছেড়ে এসেছে তা বাবার কাছে বলতে অসুবিধে হয়নি তিস্তার। তিনি বলেছিলেন, 'কিছু করার নেই। এইভাবেই কিছু মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে, এইভাবেই কেউ কেউ তার মত প্রতিবাদ জানায়। তুই বরং এম· এ· ক্লাসে ভর্তি হয়ে যা !'

এম· এ-র সেশন তখন মাঝপথে। তার রেজাল্টও এমন আহামরি নয় যে যাওয়ামাত্র বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ভর্তি করে নেবে। তিস্তার মাথায় বি সি এস পাক খাচ্ছিল। ঠিক তখনই তার কাছে একটা চিঠি এল। কলকাতার এক বিখ্যাত বিজ্ঞাপনসংস্থা তাকে দেখা করতে বলেছে।

ব্যাপারটা সে বুঝতে পারছিল না। ওই সংস্থায় কাজ করে এমন কাউকে সে চেনে না। চাকরির আবেদন জানিয়ে সে কখনও ওখানে দরখাস্ত করেনি। এত বড় সংস্থা নিজে থেকে তার কাছে কেন চিঠি পাঠাবে তা সে বুঝতে পারছিল না।

নির্দিষ্ট দিনে সে বিজ্ঞাপন সংস্থার অফিসে হাজির হল। তাকে বলা হল অপেক্ষা করতে। তারপর যখন ডাক এল তখন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এক বিশাল ঘরে ঢুকে সে সৌম্যদর্শন এক ভদ্রলোকের মুখোমুখি হল, 'বসুন।'

তিস্তা বসল। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি এখন কি করছেন ?'

'আপাতত কিছুই না। আমি বুঝতে পারছি না কোন সূত্রে আমায় ডেকে পাঠানো হল। আমি তো এখানে কোন আবেদন করিনি।'

'করেননি। রাইট। বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে ?'

'না। নেই। আমি এর আগে একটা অফিসে কাজ করেছি কয়েক মাস।'

'আপনি ইন্টারেস্টড ?'

'কি ব্যাপারে ?'

'কাজ শিখতে। আমি আপনাকে একটা সুযোগ দিতে পারি মাস তিনেকের জন্যে। এই তিনমাসে আপনাকে কাজ শিখতে হবে। ব্যাপারটার জন্যে কোন পরীক্ষার দরকার হয় না। কাজের ধরন দেখেই বোঝা যায়। আপনি রাজী ?'

'আমাকে কি কাজ করতে হবে ?'

'এজেন্সির সব কাজ। ক্লায়েন্ট ভিজিট, কাগজগুলোর সঙ্গে নেগোসিয়েশন্, দরকার হলে কপি রাইটিং, এভরিথিং। তিনমাস পরে আমরা কথা বলব।'

তিস্তা চুপ করে থাকল একটু। তারপর বলল, 'কিন্তু আমি কেন ?'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'আপনি খুব সন্দেহ করতে ভালবাসেন ?'

'না। জীবন আমাকে এটা শিখিয়েছে।' তিস্তা চোখ তুলে তাকাল।

'আই সি। বেশ, তাহলে আপনাকে খুলেই বলি। আপনি যেখানে কাজ করেছিলেন সেখানে আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের আত্মীয় কাজ করেন। তাঁর কাছে আপনার পদত্যাগের গল্পটা শুনে সে আমাকে জানিয়েছিল। এমন ঘটনা আজকাল রোজ রোজ ঘটে না। আমি আপনার সম্পর্কে খবর নিলাম। ওই অফিস থেকেই সেসব পাওয়া গেল।'

'আপনি তো আমাকে চেনেন না।'

'আপনি প্রেসিডেন্সির ছাত্রী, ইংরেজি নিয়ে পড়েছেন। দ্যাটস অল। আসলে কোন মেয়ে জীবনের নানান অড্‌সের বিরুদ্ধে লড়ছে জানলে আমার খুব ভাল লাগে। আমার মা সেটা করতে পারেননি। তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন শাশুড়ির গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে। ওকে! কি মনে হচ্ছে?'

'আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।'

'অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্যি। একটা কথা, আপনি যদি জয়েন করেন তাহলে ইউ আর টু টেক কেয়ার অফ ইওরসেল্ফ। আমাদের কাজ হল ক্লায়েন্ট যোগাড় করা যে বিজ্ঞাপন দিতে চায়। আমাদের কাজটা সহজ নয় কারণ প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয়ত ক্লায়েন্টকে এমনভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে যে সে স্যাটিসফায়েড হয়। আর সব ক্লায়েন্ট যে আপনার বাবা, ভাই বা বন্ধু এমন মনে করার কারণ নেই। তাকে না চটিয়ে নিজেকে কিভাবে দূরে রাখবেন সেটা আপনার ব্যাপার। কোম্পানি আপনাকে স্বাধীনতা দেবে সন্ধের পরে কাজ না করার। কোন ক্লায়েন্ট সেই সময়ে আপনাকে ডাকলে আপনি ইচ্ছে করলে রিফ্যুজ করতে পারেন। ডিটেইলস কাজে এলে জানতে পারবেন।'

তিস্তা ভাবছিল। বোঝাই যাচ্ছে তারের ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে তাকে। চ্যালেঞ্জটা নিলে কেমন হয়? হঠাৎ সোজা হয়ে বসল সে, 'বেশ, চেষ্টা করে দেখি।'

হঠাৎ এক অদ্ভুত জগতে ঢুকে পড়ল তিস্তা। স্পেস, সেন্টিমিটার, কলম, কালার, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ইত্যাদি শব্দ অন্যরকম মানে নিয়ে এল জীবনে। কলকাতার সব কটা দৈনিক এবং চালু সাপ্তাহিকের বিজ্ঞাপন দর ঠোঁটস্থ রাখতে হল। প্রথম দিন তাকে এক প্রবীণ ভদ্রলোককে সাহায্য করতে বলা হয়েছিল যিনি বিজ্ঞাপন আদায় করার ব্যাপারে প্রবাদ-পুরুষ। পরিচিত হবার পরে সেই ভদ্রলোক যার নাম চিত্তহরণ দত্ত, সংক্ষেপে সি আর বলেছিলেন, 'দ্যাখো বাবা, গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে মানুষ যখন বিজ্ঞাপন দেয় তখন নিশ্চয়ই সেটা সে প্রয়োজনে করে। তার প্রয়োজন নেই এমন সময়ে হাজারবার গেলেও তুমি বিজ্ঞাপন পাবে না। কিন্তু তুমি যদি সেইরকম সময়ে তাকে এই গল্পটা শোনাতে পার তাহলে কাজ হতে পারে।'

তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'কি রকম?'

'সেটা যুদ্ধের সময়। এক মাখন কোম্পানির প্রোডাকশন বন্ধ। বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বের হচ্ছে। সেসময় কোম্পানিতে স্ট্রাইক অথবা লকআউট চলছিল বলেই প্রোডাকশন হচ্ছিল না। কিন্তু ওই বিজ্ঞাপনের দৌলতে চাহিদা বহুগুণ বেড়ে গেল। ফলে তারপরে

কারখানা খুললে মাল বাজারে এলে দেখা গেল আগের চেয়ে অনেক বেশি বিক্রি হচ্ছে। বিজ্ঞাপনে মাখন কোম্পানি যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল।' সি আর বলছিলেন, 'ক্লায়েন্ট বিজ্ঞাপন দেবে কাগজে। আমরা মাঝখানে। আমাদের কর্তব্য সেই বিজ্ঞাপনকে সাজিয়ে দেওয়া, কখন কোথায় দিলে সেটা বেশি কাজে লাগবে তা বোঝানো। এর জন্যে প্রথমে যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হল ক্লায়েন্টকে মনে করিয়ে দেওয়া সে খুব মূল্যবান মানুষ।'

তিন মাস বাদে চাকরিটা পাকা হয়ে গেল তিস্তার। অর্থাৎ একটি বিশেষ স্কেলে মাইনে পাওয়ার জন্যে উপযুক্ত বিবেচিত হল। বিজ্ঞাপন জগতের চাকরি কখনই সরকারি চাকরির মত পাকাপাকি নয়। যেকোন মুহূর্তে উভয়পক্ষের কাজ ছাড়িয়ে এবং ছেড়ে দেবার স্বাধীনতা আছে। যাঁরা সত্যি কাজ জানেন তাঁদের জন্যে সবকটা বিজ্ঞাপন সংস্থার দরজা খোলা আছে সবসময়।

বাইরে ঘোরাঘুরি, ক্লায়েন্ট সার্ভিস, কাগজের অফিসে ছোটার কাজের চেয়ে বিজ্ঞাপনের কপি লেখা, দরকার মত ক্যাপসন তৈরীর কাজ তিস্তার বেশী ভাল লাগছিল। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করে একসময় বাংলায় অনেক লেখালেখি হয়েছিল। সেগুলো সংকলিত করে একটা বড় কোম্পানি বই বের করতে চাইলে তিস্তা নামকরণ করে দিল, 'আক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ।' বিজ্ঞাপন কাগজে বের হওয়া মাত্র সকলেই নড়েচড়ে বসেছিল। প্রত্যেক সপ্তাহে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা একটা কোম্পানি হোর্ডিং রেখেছিল নিজেদের প্রচারের জন্যে। সরাসরি তার প্রোডাকশনের কথা না বলে অদ্ভুত ক্যাপসন লিখে প্রচার বাড়িয়ে দিল তিস্তা। প্রতি সপ্তাহে সেটা পাল্টাতে হত। মাথা ঘামানোর এই কাজে সে এখন অনেক স্বচ্ছন্দ।

যে কোন কাজেই কিছু ঝামেলা থাকে। ক্যাপসন অ্যাপ্রুভ করাতে প্রায়ই তাকে ক্লায়েন্ট ভিজিট করতে হয়। সে লক্ষ্য করেছে সত্যিকারের ব্যবসামনস্ক মানুষ তাকে বিরক্ত করে না। চাকরি করা কর্তারা কাজের শেষে ঘুরিয়ে প্রস্তাব করেন, 'তাজের ডিনারে ফ্রায়েড চিকেন খেয়েছেন ? অপূর্ব !' সে না বললেই সরাসরি প্রস্তাব। কেউ কেউ একটু মোটা ধরনের, 'চলুন না, আজ একটু ডিনার খাওয়া যাক। আপনাদের এত কাজ দিচ্ছি অথচ আপনি আমাকে দেখছেন না।'

প্রথম প্রথম অস্বস্তি, অপমানবোধ প্রবল হয়ে উঠলেও শেষপর্যন্ত এগুলোকে চমৎকার পাশ কাটাতে শিখে গেল তিস্তা। দু বছর বাদে আর একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন সংস্থার কাছ থেকে চাকরির আমন্ত্রণ পেল। তদ্দিনে তিস্তার নিয়োগকর্তাও কলকাতা ছেড়ে বোম্বে চলে গেছেন। যে কৃতজ্ঞতাবোধ তিস্তা লালন করত তা অতদিনে বেশ কমে এসেছিল। জানিয়ে শুনিয়ে চাকরির জায়গা পরিবর্তন করল সে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সে তখন মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত।

এই রকম একটা সময় ঘটনাটা ঘটল। শনিবার অফিসের এক সহকর্মিণীর বাড়িতে গিয়েছিল তিস্তা নেমন্তন্ন রাখতে। ভদ্রমহিলা থাকেন সল্টলেকে। বেরুতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। বাস ধরে উল্টোডাঙায় নেমে ট্রেনে উঠবে। এমন কিছু বেশী সময় লাগার কথাও নয়। বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে তার পা ধরে

গেল তবু বাসের দেখা নেই। ওই এলাকা এত নির্জন যে দ্বিতীয় কোন মানুষের দর্শন পাওয়া যাচ্ছিল না। অন্ধকার পাতলা চাদরের মত জড়িয়ে রেখেছে, রাস্তার আলোকে। এমন সময় একটা প্রাইভেট গাড়িকে ছুটে আসতে দেখল সে হেড লাইট জ্বালিয়ে। গাড়িটা তার সামনে দিয়ে চলে যেতে যেতে হঠাৎ ব্রেক কষল। তারপর পিছিয়ে আসতে লাগল।

প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল তিস্তা। সল্টলেকে মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব নিয়ে সে অনেক গল্প শুনেছে। গাড়ির লোকগুলোর মতলব নিশ্চয়ই ভাল নয়। কি করবে সে যখন ভেবে পাচ্ছিল না তখন গলা কানে এল, 'কেমন আছ?'

তিস্তা চমকে উঠল। স্টিয়ারিং-এ সুমিত বসে আছে, একা। সুমিত তার দিকে তাকিয়ে আছে। স্বাস্থ্য বেশ ভাল হয়ে গেছে সুমিতের। সেই সুমিত যে চারমিনার খেতো, কথা কম বলত কফি হাউসে। সেই সুমিত যে তাকে অনুসরণ করে হোস্টেলে যেত, সেই সুমিত যে বলত ভালবাসার জন্যে লক্ষ মাইল হেঁটে যাওয়া যায়। হঠাৎ বুক মুচড়ে উঠল। তার শরীরের সর্বত্র যেসব জলকণা ছিল তা একত্রিত হয়ে হঠাৎ বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করল দুচোখ বেয়ে। মুখে হাত চেপে কান্নার শব্দটাকে আড়াল করতে পারল না তিস্তা। অভিমানী এক শিশুর মত সল্ট লেকের নির্জন বাসস্টপে দাঁড়িয়ে সে কেঁদে যেতে লাগল। তার নিঃস্বাসের কষ্ট হচ্ছিল। সব বাধা ভাঙ্গা নদীর মত একূল ওকূল একাকার হয়ে যাচ্ছিল। সম্বিত এলেও সে কিছুতেই নিজেকে সামলে নিতে পারছিল না। সুমিত বসেছিল গাড়িতে, চুপচাপ। তার মুখ তিস্তার দিকে ফেরানো।

যখন তিস্তা নিজেকে কিছুটা সামলে নিতে পারল, এইরকম আকস্মিক কান্নার জন্যে তার মনে লজ্জা এল ঠিক তখন সুমিত কথা বলল, 'আমায় লিখে না দিলে বেলেঘাটার জমিটা তো বিক্রি করতে পারবে না। কি লিখে দেবে?'

বেত্রাঘাত কি তা এ জীবনে জানা হয়নি। কিন্তু আজ তিস্তার মনে হল তার যন্ত্রণা নিশ্চয়ই এর কাছে সামান্য। সে হঠাৎ উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল অন্ধের মত। কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে তা জানা নেই। কিন্তু একটা নরপশুর দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার জন্যে সে দ্রুত হেঁটে চলেছিল। সুমিত অবশ্য পিছু ধাওয়া করেনি। চলে যাওয়া গাড়ির আওয়াজ কানে আসতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল তিস্তা। সেই অন্ধকারে হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ হল নিজের ওপর। কি বোকা সে? কোন কান্না এতদিন কার জন্যে এমন গোপনে বুকের খাঁচায় মজুত রেখেছিল?

ব্যাপারটা নিয়ে পরে সে অনেক ভেবেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় রাস্তায় বা অন্য কোথাও সুমিতকে দেখলে নিশ্চয়ই সে কাঁদত না। কান্নার কোন প্রশ্ন ওঠে না। ওই ঘটনার এক মুহূর্ত আগেও কেউ প্রশ্ন করলে সে হেসে উড়িয়ে দিত। তাহলে কান্নাটা এসেছিল কেন? কান্না এমন বিনা নোটিশ দিয়ে আসে কখন? কেন সেই মুহূর্তে বিয়ের আগের দিনগুলোর কথাই মনে আসছিল? বিয়ের পর স্বপ্নভঙ্গের ঘটনাগুলো আড়ালে চলে গিয়েছিল কেন? জবাবটা সে পায়নি। এটা এমন ব্যাপার কাউকে বলা যায় না। বাবাকেও নয়।

নার্সিংহোম থেকে চন্দনপুকুরের বাড়িতে যাওয়ার কোন কথাই উঠতে পারে না। অরিত্র এবং বাবা ওকে নিয়ে গেল শ্যামনগরে। ষষ্ঠীপুজো হল। প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হল দিনরাত। মা বললেন আজ বিধাতা পুরুষ মেয়ের কপালে ভবিষ্যৎ লিখে যাবেন। তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'সেটা তো জন্মানো মাত্র নাকি লেখা হয় !'

মা মাথা নাড়লেন, 'না। আজ ষষ্ঠীপুজোর পর লেখা হবে !'

'কি লিখবেন ?'

'আশ্চর্য ! আমি জানব কি করে ? যাতে ভাল কিছু লেখেন তাই প্রার্থনা কর।'

'কোন লাভ হবে না।'

'বেশী বুঝে গেছিস !'

'হ্যাঁ মা। বিধাতার একটা ছাপা ফর্মুলা আছে। মেয়ে জন্মালেই তার কপালে সেই ফর্মুলাটাকে ছেপে দেন। তবে ভদ্রলোক খবর রাখেন না যে দিন পাল্টে যাচ্ছে দ্রুত। নিজেদের কপালের লেখা মুছে দেবার ক্ষমতা মেয়েরা নিজেরাই অর্জন করে নিচ্ছে। তোমার নাতনিকে নিয়ে তাই আমার কোন চিন্তা নেই।'

একটা পরিবর্তন দেখতে পেল তিস্তা। মেয়ের জন্যে অরিত্র যেন চনমন করে। চন্দনপুকুরে থাকলেও অফিসে যাওয়ার সময় ফেরত পথে শ্যামনগর ঘুরে না গেলে তার চলে না। পনের কুড়ি দিনেই টিয়াও যেন বাবার স্পর্শ বুঝে ফেলল। এই ব্যাপারটা তিস্তার খুব ভাল লাগছিল। কোন মেয়ে যদি বাবার ভালবাসা না পায় তাহলে তার জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ অপূর্ণ থেকে যাবে।

মাসখানেক বাদে ফিরে এল সে চন্দনপুকুরে। সঙ্গে মা এল। কাজের মেয়েটা বাবার দেখাশোনা করতে পারবে। শ্যামনগর থেকে চন্দনপুকুর এমন কিছু দূরে না যে ইচ্ছে হলেই বাবা চলে আসতে পারবে না। মা এল তিস্তাকে গুছিয়ে দিয়ে যেতে। আজকাল অরিত্র তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে আসে। সে নাকি একজনের সঙ্গে সাময়িক ভাবে ডিউটি বদল করেছে। এখন সর্বত্র বেশ সুখ সুখ ভাব ছড়ানো।

বাবার ইচ্ছে ছিল তিস্তা ইংরেজি ভাষায় অধ্যাপনা করুক। অঙ্কের নিয়ম মেনে জীবন চললে হয়তো এতদিনে সে তাই করতে পারত। বিজ্ঞাপন জগতে সে যখন মোটামুটি অভ্যস্ত তখনই বাড়িতে একটা চিঠি এল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে। দীর্ঘকাল আগে করা কার্ডের অনুকূলে প্রথম চাকরীর পরীক্ষায় বসার আমন্ত্রণ। চাকরিটা ট্যুরিস্ট ব্যুরোয়। পাকা সরকারি চাকরি। সে বিজ্ঞাপনসংস্থায় যা পাচ্ছিল তার থেকে কম কিন্তু নিশ্চিত জীবন। বাবা বলেছিলেন, 'সোনার জামার চেয়ে সুতোর জামা অনেক আরামদায়ক। এখানে যে টেনশন নিয়ে তোকে কাজ করতে হচ্ছে, যে রাঘববোয়ালদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তা থেকে তো বেঁচে যাবি।' কথাটা মনে ধরেছিল। সিরিয়াস হয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল। তারপর ইন্টারভিউ-এর ডাক এবং চাকরি পাওয়া সহজেই হয়ে গেল। কোন টেনশন নেই। যাঁরা আসছেন তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রের হদিশ দেওয়া, খালি থাকলে ট্যুরিস্ট লজে ঘর বুক করে খবর

পাঠানো। এই তো কাজ। মেয়ে হবার জন্যে তিন মাস সবেতন ছুটি তাও তো ওই সরকারি চাকরির দাক্ষিণ্যেই।

লোক রাখতে হল টিয়ার জন্যে। মায়ের পক্ষে বাবাকে ছেড়ে বেশিদিন থাকা সম্ভব নয়। কাজের মেয়েটিকে মা বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন শ্যামনগর। তার তিন দিন বাদেই টিয়ার পেট খারাপ। পায়খানা যেন বন্ধ হতে চায় না। যমে মানুষে টানাটানি। যখন সুস্থ হল মা বলল, 'তোমাদের এখানে থাকলে ও নির্ঘাত মরে যাবে। তোমরা যে যাই বল আমি ওকে আমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

প্রথম সমর্থন এল অরিত্রর কাছ থেকেই। মেয়ে কোথায় ভাল থাকবে তা যেন সে বুঝে গিয়েছিল। অতএব মেয়ে চলে গেল শ্যামনগরে। কয়েকটা দিন খুব খারাপ কেটেছিল তিস্তার। মন কেমন করত খুব। অফিস থেকে বারাকপুরে না নেমে চলে যেত সে শ্যামনগরে। সেখান থেকে ফিরতে রাত সাড়ে নটা। পরিশ্রম হত কিন্তু মেয়েকে দেখতে পাওয়ার আনন্দের কাছে সেটা কিছুই নয়।

মেয়ে হবার পর থেকে অন্য একটা চিন্তা তিস্তাকে বিব্রত করত। চিন্তা অরিত্রর আচরণ নিয়ে। শরীরে সন্তান আসার পর থেকেই সে এমন একটা ভাব করতে লাগল যে কাছাকাছি গেলে তিস্তার ক্ষতি হয়ে যাবে। হাস্যকর ওই ভাবনাটাকে কিছুতেই তিস্তা অরিত্রর মন থেকে সরাতে পারেনি। টিয়া জন্মাবার পর সে যখন সুস্থ হয়ে অফিস করছে তখনও অরিত্র নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। নিত্যনতুন ফন্দী আঁটতে লাগল সে। শেষ ট্রেনে বাড়ি ফেরা, তিস্তার ঘুম না ভাঙিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়ায় ও যেন স্বস্তি পেত। ছুটির দিনে তিস্তা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ব্যাপার কি?'

'কেন?'

'তুমি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ!'

'বাঃ, কোথায় এড়ালাম। আসলে আমার চাকরিটা এমন—।'

'তোমার আর শরীরে চাহিদা নেই, না?'

'তা নয়। আসলে—।'

'তোমার খারাপ লাগতে পারে, আমি একজন মানুষ। কাঁচের পুতুল নই। স্বামীর সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক থাকলে আমিও এসব আশা করতে পারি।'

'তিস্তা, ব্যাপারটা, সত্যি বলছি, আর আমাকে টানে না।'

'টানে না?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে আমি তোমার কাছে আকর্ষণহীন হয়ে গেছি?'

'না, না, তুমি নও। আমি নিজেই—।'

'ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন?'

'ডাক্তার?'

'হ্যাঁ। তোমার বয়সে এটা এ্যাবনর্মাল ব্যাপার!'

'ও।'

'তুমি ডাক্তার দেখাবে।'

'আশ্চর্য ! আমি ডাক্তারের কাছে গিয়ে কি বলব ?'

'তোমার প্রব্লেমটা বলবে।'

'দূর। আমার লজ্জা করে।'

'আমি এসব বাজে কথা শুনতে চাই না।' তিস্তা কড়া গলায় কথাগুলো বললেও কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছিল। বিয়ের পর একদম স্বাভাবিক ছিল যে মানুষ সে মেয়ের জন্মানোর পর এমন পাল্টে যেতে পারে ? তিস্তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। সে বলল, 'আমরা বিয়ে করেছিলাম কেন তোমার মনে আছে ?'

'তা থাকবে না কেন ?'

'আমরা পরস্পরের সঙ্গ চেয়েছিলাম।'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু কি পাচ্ছি ? আমি অফিসে বেরুবার সময় তুমি ঘুম থেকে ওঠ। আমি রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার পরে তুমি বাড়িতে ঢোক। চমৎকার সম্পর্ক। আমি এই সম্পর্ক কখনও চাইনি। বিয়ে না করলে কি তফাৎ হত ?'

হত। আমাদের একটা মেয়ে থাকত না,

'সেই মেয়েকে মানুষ করছে আমার মা। তোমার বা আমার সেই কাজটা করার ক্ষমতা হচ্ছে না। অথচ বিয়ের আগে তুমি রোজ ছুটির পর দেখা করতে।'

'ও, দ্যাখা, 'হত। দ্যাখো, বিকেলে ঘণ্টা দেড়-দুয়েকের জন্যে অফিস থেকে কেটে পড়া যায়। ওই সময় কাজের প্রেসার কম থাকে। ওই সময় এখনও আমি তোমার সঙ্গে কলকাতার রেস্টুরেন্ট কফিহাউসে দেখা করতে পারি। কিন্তু ওই সময়ে চন্দনপুকুরে এসে আবার ফিরে যাওয়া কি সম্ভব ? তুমি বল !' অরিত্র জবাব দিয়েছিল।

হয়তো ঠিক। যুক্তি মানুষকে অনেক আড়াল এনে দেয়। সেই যে বিখ্যাত কথা, হৃদয়ের নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে যা কখনই মস্তিষ্ক বুঝবে না। অরিত্র এখন মস্তিষ্কের শরণাপন্ন হৃদয়কে সরিয়ে দিতে। কিছু করার নেই। জীবনকে জীবনের মত মেনে নেওয়া ছাড়া বেঁচে থাকা যায় না।

অফিসে আবার যাতায়াত শুরু করার দিন দশেক বাদে এক বিকেলে টেলিফোনটা এল। স্বপ্না এসে বলল, 'তিস্তা, তোমার ফোন।'

উঠে রিসিভার তুলল তিস্তা, 'হ্যালো !'

'আমি কি তিস্তা সেনের সঙ্গে কথা বলছি ?' একজন মহিলার গলা।

'হ্যাঁ। আপনি ?'

'আমার নাম বললে আপনি চিনতে পারবেন না। আমি ইন্টারন্যাশন্যাল এক্সপোর্ট এজেন্সিতে কাজ করি। অফিসটা খাদি গ্রামোদ্যোগের পাশে। তিন তলায়।'

'ও। কেন ফোন করছেন।'

'আমার নাম নীলিমা সেন।'

'ও।'

'চিনতে পারেননি নিশ্চয়ই।'

'না।'

'আমি আপনাকে অনেকদিন আগে টেলিফোন করতে পারতাম। করিনি। কারণ আমি অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম। আপনার তো একটা বাচ্চা হয়েছে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে আপনার কি প্রয়োজন?'

'প্রয়োজন আছে। এখন থেকে আপনি আর আপনার মেয়ে আমার দয়ায় বেঁচে থাকবেন। আমি ইচ্ছে করলে আপনাদের রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি।'

'কি বলছেন?' তিস্তা কিছুই বুঝতে পারছিল না।

'বোঝার চেষ্টা করুন। আমি নীলিমা সেন। অরিত্র সেনের বিবাহিতা স্ত্রী। আমাদের ডিভোর্স হয়নি। বিয়ের পর যেকোন কারণে আমরা একমত ছিলাম না? চোরের মত অরিত্র আমাকে ছেড়ে দিয়ে আপনাকে বিয়ে করেছে। ওর খুব বাচ্চার শখ। ও বাচ্চা যাতে পায় তাই অপেক্ষা করেছি এতদিন। এখন আমি ইচ্ছে করলে ওকে জেলে পাঠাতে পারি। হাতকড়া দিয়ে থানায় পাঠাতে পারি। ওর জীবন আমার হাতে। আর আপনি? আপনার বিয়েটাই অবৈধ। আপনার সন্তান জারজ সন্তান। কিন্তু এসব আমি করব না। এখন তো নয়ই। শুধু এই ভেবে আনন্দ পাব যে আপনারা আমার দয়ায় বেঁচে আছেন।' খট্ করে লাইনটা কেটে গেল ওপার থেকে।

শেষ কথাগুলো যেন কানে ঢুকছিল না। কোন শব্দই আর আলাদা করে মানে তৈরী করছিল না। চোখের সামনেটা সাদা। তিস্তা ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল। সহকর্মীরা ছুটে এল অবস্থা দেখে। জল হাওয়ার ব্যবস্থা হল। বাচ্চা হবার পর ট্রেনযাত্রার ধকলের জন্যে এমনটা হয়েছে বলে ধারণা হল অনেকের। স্বপ্না টেলিফোন করল আকাশবাণীতে। অরিত্র বিব্রত গলায় বলল, 'সেকি? কেমন আছে? ও। কিন্তু এখন আমার রেকর্ডিং চলছে, বেরুবো কি করে? আচ্ছা, দেখি।'

স্বপ্নার খুব রাগ হয়ে গেল। তিস্তার চেতনা ফিরে আসতেই সে পাথরের মত বসে রইল। স্বপ্না যখন অরিত্রর কথা বলল তখন একবার মুখ ফেরালো মাত্র। একটু একটু করে শক্তি ফিরে এল শরীরে। সহকর্মীদের আপত্তি গ্রাহ্য না করে তিস্তা রাস্তায় পা রাখল।

এখন তার কেবলই মনে হচ্ছিল এসব মিথ্যে। বানানো। কেউ তাকে যন্ত্রণা দেবার জন্যে গল্পটা করেছে। অরিত্রর মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। ডিভোর্স না হলে তিনি কখনই বিয়েতে অনুমতি দিতেন না। সে আকাশবাণীর দিকে হাঁটতে লাগল। কথাটা মিথ্যে তা অরিত্রর মুখে না শুনলে সে বিশ্বাস করতে পারবে না। আকাশবাণীর কাছে পৌঁছে ওর হঠাৎ মনে পড়ল ব্যাপারটা যখন সত্যি তখন অরিত্রকে প্রশ্ন করা মানে ওকে অপমান করা নয়? না, সে প্রশ্ন করবে না। শুধু ফোনের ব্যাপারটা জানিয়ে দেবে।

রিসেপশনে আজ বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না তিস্তাকে। হন্তদন্ত হয়ে অরিত্র ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোমার?'

'কিছু না।'

'আমাকে তোমার অফিস থেকে বলল তুমি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছ।

মুখচোখ তো বলছে শরীর খারাপ। কি হয়েছে?'

'একটু মাথা ঘুরে গিয়েছিল।'

'কেন? খাওয়া-দাওয়ার গোলমাল হয়েছে?'

'না।'

'ডাক্তার দেখেছে?'

'তার দরকার হয়নি। এখন ঠিক হয়ে গেছি।'

'ও। তাহলে দাঁড়াও, দেখি ছুটি ম্যানেজ করতে পারি কিনা।'

'অরিত্র।'

'বল।'

'আজ একটা অদ্ভুত টেলিফোন পেলাম।'

'তাই নাকি? কি ব্যাপার?'

'তোমার প্রথম স্ত্রীর নাম নীলিমা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'সে আবার এর মধ্যে আসছে কেন?'

'যে ফোন করেছিল সে নিজের নাম বলল নীলিমা সেন।'

'নীলিমা ফোন করেছিল তোমাকে? যাঃ, বিশ্বাস করি না।'

'আমিও না। কেউ মিথ্যে ফোন করেছে।'

'কি বলল সে?'

'বলল তোমাদের ডিভোর্স হয়নি। বলল, এখন থেকে তার দয়ায় আমরা বেঁচে থাকব। আমাদের বিয়েটা অবৈধ। টিয়া জারজ সন্তান। উঃ। কে এই মহিলা? আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।'

অরিত্র চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তিস্তা বলল, 'নীলিমা কি ইন্টারন্যাশন্যাল এক্সপোর্ট এজেন্সিতে চাকরি করে?'

'হ্যাঁ।'

'ওর টেলিফোন নাম্বার জানো?'

'কেন? কি হবে?'

'ওঁকে ফোন করব। আমি জানতে চাইব টেলিফোনটা ও করেছিল কিনা!'

অরিত্র বলল, 'ছেলেমানুষী করো না। ও তোমাকে অপমান করতে পারে।'

'করুক। কিন্তু আমি ওর মুখেই শুনতে চাই টেলিফোনটা ও করেনি।'

অরিত্র ঘড়ি দেখল। তারপর বলল, 'এখন ওদের ছুটি হয়েছে।'

তিস্তার এটা খেয়ালে ছিল না। সে খুব হতাশ হল। অরিত্র বলল, 'এ নিয়ে বেশী টেনসন করো না। তুমি কি একা বাড়িতে যেতে পারবে?'

'হ্যাঁ।' তিস্তা এগোল। তাকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল অরিত্র। খুব আন্তরিক গলায় বলল, 'তুমি যদি এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে পার তাহলে আমি ম্যানেজ করে বেরিয়ে পড়তে পারি।'

তিস্তা মাথা নাড়ল। অরিত্রকে সরাসরি প্রশ্নটা করতে ইচ্ছে করছিল ওর। কিন্তু পারল না। বারংবার কি একটা বাধা হয়ে যাচ্ছিল। একা বাসে স্টেশনের দিকে যেতে যেতে তিস্তার মনে হল অরিত্র নিজেও তো একবারও কথাটা অস্বীকার করল না! কেন করল না? মানুষটা কি কোন কিছুতেই আর রিঅ্যাক্ট

করে না ?

সরাসরি শ্যামনগরে চলে এসেছিল সে ! মা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কি হয়েছে ?'

'কিছু না।' তিস্তা টিয়ার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। টিয়া ঘুমাচ্ছে।

'কিছু একটা হয়েছে তা তোকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে !'

তিস্তা জবাব না দিয়ে নিচু হচ্ছিল, মা বাধা দিল, 'না। বাইরের জামাকাপড় হাত ধুসনি, এইটা কখনও করবি না।'

বাথরুমে ঢুকে মিনিট পনের শরীরে জল ঢেলেও শান্তি নেই। স্নানের শেষে মেয়ের পাশে এসে শুয়ে পড়ল সে। একদম পুতুল পুতুল চেহারা হয়েছে মেয়েটার। নাকটা ভারি মিষ্টি। হঠাৎ বুকের মধ্যে কাঁপুনি আসতেই মেয়ের গায়ে হাত রাখল তিস্তা। না, হতে পারে না, কক্ষণো নয়।

কথাগুলো কাউকে বলা যায় না। এমন কি বাবা মাকেও নয়। তিস্তাকে যারা ভালবাসে তারাই চমকে উঠবে। রাত্রে ফিরে গেল তিস্তা। মা ঠেলেঠুলে পাঠাল। অরিত্র বাড়ি ফিরে খাবার পাবে না। সাড়ে নটায় বাড়িতে ঢুকে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। সে খুব আশা করেছিল আজ অরিত্র তাড়াতাড়ি ফিরবে। কিন্তু তার বদলে মিসেস চক্রবর্তী এলেন, 'অরিত্রবাবু টেলিফোন করেছিলেন। আজ রাত্রে ফিরতে পারবেন না। সমস্ত কর্মচারীকেই স্পেশ্যাল ডিউটি দেওয়া হয়েছে। আবার শরীর খারাপ হয়েছে শুনলাম।'

'কে বলল ?'

'উনিই বললেন।'

'এমন কিছু না।'

'কাজের মেয়েটাকে পাঠিয়ে দেব ?'

'না, না। ঠিক আছি।'

সকাল নটায় যখন তিস্তা তৈরী তখন অরিত্র এল। ঝড়ো কাকের মতো চেহারা। বলল, 'দিল্লী থেকে একটা জরুরী অ্যানাউসমেন্ট করার কথা ছিল। মিনিস্ট্রি ভেঙে যেতে পারত গতকাল। তাই সবাইকে থাকতে হয়েছে। তুমি কেমন আছ ?'

'ভাল। নীলিমার টেলিফোন নম্বরটা বলবে ?'

'ওঃ। এখনও ওই ভূত তোমার মাথা থেকে যায়নি।'

'যায়নি উল্টে গলার দিকে হাত বাড়িয়েছে।'

'বিশ্বাস করো, কত বছর হয়ে গেল, এক্সচেঞ্জ নম্বরও বদলে গিয়েছে, আমার কিছুই মনে নেই। আগে টু থ্রি ছিল।'

'এলাম।'

অরিত্র ওর দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু কিছু বলছে না। তিস্তা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল। তারপর আচমকাই ঘুরে হনহন করে হাঁটতে লাগল।

অফিসে বসে টেলিফোন গাইড থেকে নম্বরটা বের করল তিস্তা। তারপর একটু নার্ভাস হয়েই টেলিফোন করল। ওপাশে অপারেটর ধরতে সে নীলিমা সেনকে চাইল। মেয়েটি বলল, 'উনি আজ দেরিতে আসবেন। লাঞ্চের পর

করুন।'

অস্বস্তি আরও বাড়ল। তিস্তার আর তর সইছিল না। সে তার কাজও ঠিক মত করতে পারছিল না। লাঞ্চ হতেই টেলিফোনের কাছে চলে গেল সে। এবার অপারেটার লাইনটা দিল। হাত কাঁপছিল তিস্তার। সে কি নিজের পরিচয় দেবে ? অরিত্র বলেছে তাকে অপমানিত হতে হবে। নাকি গলার স্বর গতকালের মত হলেই রিসিভার নামিয়ে রাখবে ?

'হ্যালো। নীলিমা সেন বলছি।'

ফাঁপড়ে পড়ে গেল তিস্তা। এই গলা কি ? সে বুঝতে পারছিল না।

'হ্যালো !'

তিস্তার গলা থেকে শব্দ বের হয়ে এল, 'হ্যালো !'

'হ্যাঁ বলুন, কে বলছেন ?'

'আমি তিস্তা। একটু বিরক্ত করছি। গতকাল কি আপনি ফোন করেছিলেন ?'

'কেন ? সন্দেহ হচ্ছে ?' আমি করেছিলাম। এবং যা বলেছিলাম সব সত্যি। আমাকে যদি তোমরা বিরক্ত না করো তাহলে আমি আগ বাড়িয়ে কিছু করব না। কিন্তু করতে পারি।'

'আপনি আপনি বলছেন অরিত্রর সঙ্গে— ।'

'তুমি আমার অফিসে আসতে পার।' টেলিফোনের লাইন কেটে গেল।

শরীর আবার গতকালের মত ঝিম ঝিম করতে লাগল। কিন্তু আজ সামলে নিতে পারল সে। অফিস থেকে অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তখনই। হেঁটে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। মিশন রো এবং গণেশ এ্যাভিন্যুর হকারঠাসা ফুটপাত ধরে কি ভাবে হেঁটেছিল রোদ মাথায় নিয়ে তা নিজেরই খেয়াল নেই।

একটা পার্টিসন দেওয়া খুপরিতে নীলিমার টেবিল। আর পাঁচজনের থেকে যখন আলাদা তখন পদে মর্যাদা আছে। সেখানে উপস্থিত হতে নীলিমা হাসল, 'তুমিই তিস্তা, বসো। তুমি বলছি বলে কিছু মনে করো না।'

অরিত্রর প্রথম স্ত্রীকে অবাক হয়ে দেখছিল তিস্তা। চল্লিশের কাছেই বয়স। প্রচণ্ড প্রসাধন, জামা সংক্ষিপ্ততম। ভদ্রমহিলাকে ঈশ্বর যে তেমন সৌন্দর্য দেননি সেটা না মানতে চাওয়ার ঘোষণা চড়া গলায় করা হয়েছে। তিস্তা বসল।

'বলো। টেলিফোনে কি বলছিলে ? এক সেকেন্ড, চা খাবে ?'

'না।'

'বেশ। হ্যাঁ— ।'

'আপনাদের ডিভোর্স হয়নি ?'

'একদম না।'

'আপনি সত্যি বলছেন ?'

'মিথ্যে বলার কোন কারণ নেই। ডিভোর্স হলে অরিত্র কাগজ দেখাতে পারে। এটা তো জলের মত পরিষ্কার।' নীলিমা হাসল।

'আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'গতকাল অরিত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলে ?'

'না।'

'জিজ্ঞাসা করলেও জবাব পেতে না। যে জবাব দিতে ওর অসুবিধে হত সেটা ও দিত না। মুখ বুঁজে থাকত। অন্তত আমার সময়ে তাই দেখেছি।'

তিস্তা ভদ্রমহিলাকে দেখল। মানুষের কোন কোন স্বভাব আদৌ বদলায় না একথাটা বলার প্রয়োজন মনে করল না।

'অরিত্র যে আবার বিয়ে করতে যাচ্ছে তা আপনি জানতেন?'

'জেনেছিলাম।'

'আশ্চর্য! জেনেও আপনি চুপ করেছিলেন?'

'কি করতাম? যে লোক দুপুরবেলায় চুপি চুপি চোরের মত স্যুটকেশ গুছিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় তাকে আমি কি বলতাম? দোহাই, এমন কাজ করো না?'

'আপনার বিরুদ্ধে ওর কোন মামলা শুরু হয়নি?'

'না। সেটা করতে গেলে যে উৎসাহ থাকা দরকার তাও ওর ছিল না। বরাবর অন্যের ওপর নির্ভর করেই ওর চলেছে। যখন ওর চাকরি ছিল না তখন আমিই ওকে চালিয়েছি। আমাকে ওর পছন্দ হত না সেটা ওর প্রব্লেম।'

'আপনাদের নাকি কোন মিল হয়নি?'

'না। সেই কারণেই আমি ওর সন্তানের মা হতে চাইনি।'

'আমাদের বিয়ে হয়েছে অনেকদিন। এতটা সময় চুপ করে ছিলেন কেন?'

'আগে আমি থানায় ডায়রি করলে অরিত্রকে ধরে নিয়ে যেত! কেস হত, জেলও হত। তুমি নতুন করে জীবন শুরু করতে পারতে। এখন তোমাদের সন্তানের জন্যে সেসব সম্ভব নয়। এটাই আমার জয়।'

'আপনি কি চাইছেন?'

'আনন্দ।'

'মানে?'

'প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে আমার ওপর যে অন্যায় হয়েছিল এখন তার প্রতিশোধ নিতে পারি। নিচ্ছি না দয়া করে। এটাই আনন্দ।'

'আমি, আমি আপনার কোন কথাই বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'ঠিক আছে। অরিত্রর মায়ের কাছে তুমি তো একবার গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি তোমাকে বরণ করে ঘরে তোলেননি কেন?'

'পারিবারিক প্রব্লেমের কথা বলেছিলেন।'

'না। কারণ অরিত্র ছেড়ে চলে এলেও আমি এখন পর্যন্ত ওই বাড়িতেই আছি। ওঁর দেখাশোনা আমিই করছি। ছেলেকে তিনি যতই স্নেহ করুন যা কিছু যত্ন আমার কাছেই পাচ্ছেন। এ অবস্থায় তোমাকে ওই বাড়িতে যেতে বলেন কি করে?'

'কি বলছেন আপনি? উনি সব জানতেন?'

'না জানার তো কিছু নেই।'

দুহাতে মুখ ঢাকল তিস্তা, 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। উনিও আমার সঙ্গে প্রতারণা করলেন? উনি—।'

'স্নেহান্ধ মহিলা। আমার খাচ্ছেন, আমার পরছেন আর প্রায়ই ছেলেকে দেখতে চাইছেন। আমি বলেছিলাম ছেলের কাছে যান। তা যাবেন না।'

'আপনি সেই থেকে অরিত্রদের বাড়িতেই আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'অরিত্র আপনাকে ছেড়ে যাওয়ার পরেও থাকতে পারছেন?'

'কেন পারব না? সে যেতে পারে কিন্তু আমার আইডেন্টিটি তো নষ্ট হয়নি। আমি অরিত্র সেনের আইনসম্মত স্ত্রী। ওর সব কিছুর ওপর আমার অধিকার আছে। আর বুড়িটাকে দেখার জন্যেও আমার থাকা দরকার ছিল।'

আমি অরিত্র সেনের আইনসম্মত স্ত্রী। পাঁচটা শব্দ। একটা বিশাল বর্শার মত বিদ্ধ করল তিস্তার হৃদপিণ্ডকে। আমি কে? কেউ নয়? রক্ষিতা। বেআইনি বউ? অসম্ভব। তিস্তা উঠে দাঁড়াল, 'আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।'

'কি? ও, আমাদের বাড়ি? যাও। দেখবে আমার একটা লাল ম্যাক্সি ভেতরের বারান্দায় শুকোচ্ছে। আমার একটা কথা ভাবতে অবাক লাগছে, বিয়ের আগে তুমি ওর কাছে ডিভোর্সের কাগজপত্র দেখতে চাওনি কেন?'

তিস্তা দাঁড়াল না। প্রশ্নটার জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। নিচে নেমেই সে ট্যাক্সি নিল। শেষ সত্যিটা নিজের চোখে দেখতে চায় আজ। কেন দেখতে চাইনি সেদিন কাগজপত্র! অরিত্রও চায়নি তার কাছে সুমিতের সঙ্গে বিচ্ছেদের প্রমাণপত্র দেখতে। কে চায়? বিশ্বাসটাকে প্রথম দিনেই মেরে ফেলে যন্ত্রের জীবন কাটাতে পারে কজন?

দরজার কড়া নাড়ল তিস্তা। তৃতীয়বারে সাড়া এল। দরজা খুললেন অরিত্রর মা। প্রথমে বোধহয় চিনতে অসুবিধে হচ্ছিল। কিন্তু চিনতে পারামাত্র উনি উচ্ছ্বসিত হলেন, 'এসো মা, এসো। কতদিন পরে তোমায় দেখলাম।'

নিজেকে কোনমতো সংযত করে তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছেন?'

'আর থাকা! ট্রেনে উঠে বসে আছি কিন্তু ট্রেন ছাড়ছে না। দিনরাত ডাকছি ঠাকুর নিয়ে নাও। তিনি তো কালা, শুনবেন কেন? ছেলে কেমন আছে?' তিস্তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনার ছেলে খারাপ থাকবে কেন?'

'তোমার হাত পড়েছে। আমি তখনই জানি তুমি ওকে অযত্ন করবে না। আগের বউ তো শাকচুন্নি। উঠতে বসতে কথা শোনাতো গো।' বৃদ্ধার হঠাৎ খেয়াল হল, 'তা এদিকে এসেছিলে বুঝি? তাই দেখা করে গেলে! ভালই করেছ। দুপুরবেলায় আমি একাই থাকি। সময় কাটতে চায় না।'

'অন্যসময় কে থাকে?'

'কেন? খোকার বড় বউ?'

তিস্তা শক্ত হয়ে গেল। আর কিছু জানার নেই। বলার নেই। বৃদ্ধা বলে চললেন, 'সে তো এ বাড়ি থেকে কোথাও যায়নি। সংসার তো তার টাকায় চলছে। মুখ করে খুব, শাকচুন্নি বলি আর যাই বলি খরচাপাতি তো সে-ই করে। তা তোমার মনে নেই? খোকা তোমাকে এখানে এনেছিল এক দুপুরে, আমি বলে দিয়েছিলাম তোমাদের এ বাড়িতে থাকা চলবে না। মনে নেই?'

'বলেছিলেন। কিন্তু অজুহাতটা ছিল আপনারা কনজারভেটিভ, তাই।'

'আর কিভাবে বলব বাপু। সতীন নিয়ে ঘর করবে কেন বলা কি ঠিক?'

'আপনি জানতেন আমরা বিয়ে করব!'

'জানতাম তো। খোকা আমাকে বলে গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম যাতে তুই সুখ পাস তাই কর। এই বউ তোকে সুখ দেবে না তা বুঝে গিয়েছি।'

'আপনি জানতেন না আপনার খোকা ডিভোর্স করেনি।'

'ওমা। তা কেন করবে! ডিভোর্স মানে তো ছাড়াছাড়ি আইন থেকে করিয়ে দেবে। তাহলে বড় বউ এখানে থাকবে কি করে!'

'ডিভোর্স না করেই আমাকে বিয়ে করছে তাও জানতেন?'

'হ্যাঁ। আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না বাপু।'

'আপনি সত্যিই বুঝতে পারছেন না?'

'না। পুরুষমানুষ যদি দুটো বিয়ে করে তাহলে অন্যায় কি!' বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন, 'আমার ঠাকুর্দার দুটো বিয়ে ছিল। আমার বাবাও দুই বিয়ে করেছিলেন।'

'আপনি জানেন না হিন্দু বিবাহ বিল পাশ হবার পর স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ আইনসম্মতভাবে না করে দ্বিতীয়বার বিয়ে করা যায় না?'

'তাই নাকি? ওমা! না, না। ভুল বলছ। ওই যে সিনেমার নায়ক, কি যেন, ধর্মেন্দ্র, সে তো বউ বাচ্চা থাকা সত্ত্বেও হেমামালিনীকে বিয়ে করেছে। এই বিয়ে তো সবাই মানছে। ছেলেপুলোও তো হয়েছে বলে শুনছি। কি যে বল। আসলে তোমাদের মধ্যে ভাব থাকলেই হল, পাড়ার কে কি বলছে বয়ে গেল। এসব কথা আবার বড় বউমার সামনে বলা যাবে না। চা খাবে?'

নোনা চন্দনপুকুরে আজকাল সন্ধে থেকেই ঝুপ করে রাত নেমে যায় না। কোথাও কোথাও নিত্য মাইক বাজে আর তার সুর কানের পর্দায় ক্রমাগত আঘাত করে যায়। অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে থাকা তিস্তা আবিষ্কার করল সেই মাইকগুলোও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

ঘুম নেই। দুটো চোখ আজ একদম খটখটে শুকনো। নিঃশ্বাসের কষ্ট ছাড়া অন্য কোন অনুভূতি নেই। একটা দিন না একটা জীবন। কি অদ্ভুতভাবে কেটে গেল। এখন শুধু অরিত্রর ফেরার জন্যে অপেক্ষা করা।

রাত বাড়ছে। অন্ধকারে ঘড়ির কাঁটা দেখল সে। বারোটা দশ। খুটখাট শব্দ এল কানে। তালা খোলা হচ্ছে। এটা কোন চোর করতে পারে। করুক। তিস্তা একটুও নড়ল না। আলো জ্বলল বসার ঘরে। এ ঘরে পায়ের শব্দ। একটু থমকালো। তারপর নীল আলোটা জ্বলে উঠল। তিস্তা মুখ ফেরালো।

অরিত্র অবাক হল। তাকে খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল, 'ঘুমাওনি?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলব অরিত্র।'

'হ্যাঁ, বলো।' অরিত্র একপা এগোতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল।

'তুমি নীলিমাকে ডিভোর্স করেছিলে?'

নিঃশ্বাস ফেলল অরিত্র। তারপর হেরে যাওয়া গলায় বলল, 'পারিনি।'

'পারোনি ?' চিৎকার করে উঠল তিস্তা, 'তুমি আমাকে মিথ্যে বলেছিলে ?'

অরিত্র চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। উত্তেজিত তিস্তা ছুটে গিয়ে ওর জামা আঁকড়ে ধরল, 'চুপ করে থাকলে আমি ছাড়ব না। তুমি আজ আমায় কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছ ? বল, কেন মিথ্যে বলেছিলে ? চিট্ !'

অরিত্র নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল না। তিস্তা আরও ক্ষেপে গেল, 'বোবার মত দাঁড়িয়ে থেকো না। এটা তোমার পুরোন কায়দা। এ কায়দা আর মানব না। বল, কেন আমাকে চিট করেছ ?'

'আমি তোমাকে ঠকাতে চাইনি।'

গায়ের সমস্ত জোর একসঙ্গে করে ঠেলে দিল তিস্তা অরিত্রকে। ছিটকে পড়ে যেতে যেতে কোনরকমে নিজেকে সামলাতে পারল অরিত্র। কিন্তু আলমারির কোণায় কনুই ঠুকে যাওয়ায় সে খুব ব্যথা পেল। অন্য হাতে জায়গাটাকে আঁকড়ে ধরে অরিত্র সোজা হল, 'তোমার সঙ্গে আলাপের সময় আমি জানতাম নীলিমা ডিভোর্স মামলায় কনটেস্ট করবে না। শেষপর্যন্ত ও সেটা করল। কাগজপত্র দেখতে চাইলে দেখাতে পারি। ও বলেছিল ডিভোর্স দেবে না বটে কিন্তু আমি যেখানে ইচ্ছে গিয়ে থাকতে পারি, ও আমাদের বাড়িতেই থাকবে, যাকে খুশী তাকে বিয়ে করতে পারি ও কোন আপত্তি করবে না। সেই সময় তুমি বিয়ের কথা বলছিলে। আমি অনেক ভেবেছি। সত্যি কথা বললে তুমি আমায় কখনই বিয়ে করতে না। নীলিমার সঙ্গে আমার শারীরিক বা মানসিক কোন সম্পর্ক ছিল না। আমার দ্বিতীয় বিবাহতে ওর কোন আপত্তি নেই। তাই আমি তোমাকে হারাতে চাইলাম না। আমি ওই ছোট্ট মিথ্যে কথা বলেছিলাম।'

'ছোট্ট মিথ্যে ! বাঃ। এক চামচ সায়োনাইড !'

'তুমি একটু বেশী উত্তেজিত হচ্ছ !'

'মানে ? হোয়াট ডু ইউ মিন ?' বিস্ময় ছিটকে বের হল তিস্তার গলায়।

'নীলিমার সঙ্গে আমার আইনসম্মত ডিভোর্স হয়নি এ কথা ঠিক কিন্তু ডিভোর্সের বাকি কি আছে ? আমাদের মনের কোন সংযোগ নেই। আমরা কেউ পরস্পরের জন্যে ভাবি না। যেহেতু সে ওই বাড়িতে আছে তাই আমি মায়ের সঙ্গে সেখানে গিয়ে দেখা করি না। মায়ের সঙ্গে দেখা হয় অন্য আত্মীয়ের বাড়িতে। তিনি কখনই ওই বাড়ি ছেড়ে আসবেন না। তোমার কাছে এগুলোর কোন মূল্য নেই ?'

'ছিল।'

'ছিল ? এখন নেই ?'

'না। তুমি যদি নিজে থেকে স্বীকার করতে, বলতে মিথ্যে বলেছ, কষ্ট হলেও আমার ভাল লাগত। এখন তোমার নীলিমা আমাকে খাঁচায় পুরে লোহার শিক দিয়ে খোঁচাচ্ছে, এইসময় তুমি স্বীকার করলে আমার কি এসে যায় !'

'নীলিমা তোমাকে শাসিয়েছে ?'

'কেন ? কি করবে ? বউকে ধরে মারবে ?'

'ও আমায় কথা দিয়েছিল এরকম করবে না।'

'কথা দিয়েছিল। নীলিমা তোমার সব খবর রাখে। তোমার মাতৃদেবী একবার ওর দিকে একবার—। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না তোমার মা কি করে বিয়ের আগে এত বড় সত্যিটা আমার কাছে চেপে গেলেন। কি লাভ হল তাঁর ? ছিঃ।' হঠাৎই কান্নাটা এল। চেষ্টা করতে লাগল তিস্তা সেটাকে লুকিয়ে রাখতে। না, সে কাঁদবে না। কিছুতেই না।

'টেক ইট ইজি তিস্তা। আমি তো বদলাইনি। আমাদের সম্পর্ক তো মিথ্যে নয়। ভুলে যাও টেলিফোনটার কথা। তুমি যদি চাও তাহলে আমি নীলিমার কাছে গিয়ে বলতে পারি ও যেন প্রতিশ্রুতি মনে রাখে।'

'না। নেভার। কারো করুণাকে আমি ঘেন্না করি।' উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল তিস্তা।

বুকের ভেতর লক্ষ চিতা শব্দ করে পুড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর কোথাও বিশ্বাসের জমি নেই। একা ভাবতে ভাবতে ক্রমশ পাগলের মত মনে হচ্ছে নিজেকে। দাঁড়াতে গেলেই মাথা ঘুরে যাচ্ছিল, নিঃশ্বাস ভারী, যেন একটা লোহার বল গলার নিচে ঝুলছে। সকালে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে তিস্তা আবার বিছানায় পড়েছিল। তার মাথা যেন কাজ করছিল না।

আজ অরিত্র তাড়াতাড়ি উঠেছে। হয়তো ঘুমায়নি রাত্রে। কিন্তু সকাল হতেই সে কোনরকমে চা তৈরী করে তিস্তার জন্যে এক কাপ এনেছে। তিস্তা তাকিয়ে দেখেছে কিন্তু স্পর্শ করেনি। আজ অফিসে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। দুটো মানুষ দু'ঘরে চুপচাপ বসেছিল। এই সময় তিস্তার বাবা হঠাৎ এলেন। আজকাল বয়সের কারণে খুব কম বের হন ভদ্রলোক। নাতনির জন্যে যা কিছু ছোটাছুটি।

অরিত্র দরজা খুলে দিয়েছিল। ভদ্রলোক স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি হে, তোমাদের খবরাখবর কি ?'

অরিত্র জবাব দেয়নি। মাথা নিচু করেছিল। সেটা লক্ষ্য না করে ভদ্রলোক ভেতরের ঘরের দরজায় পৌঁছে মেয়েকে দেখতে পেলেন, 'একি রে ! তৈরী হসনি ; বেরোবি না ?'

তিস্তা অপলক তাকিয়ে রইল।

তিস্তার বাবা এগিয়ে এলেন, 'কি হয়েছে ? শরীর খারাপ নাকি ?'

তিস্তা খুব নীচু গলায় বলল, 'বাবা !'

'হ্যাঁ। দেখি জ্বর এসেছে কিনা।' কপালে হাত রাখলেন তিনি, 'একটু গরম লাগছে বটে তবে এখনও আসেনি। চোখ মুখ বসে গেছে, রাত্রে ঘুমাসনি ?'

'বাবা, বসো।' তিস্তা স্পষ্ট বলল।

ভদ্রলোক বেশ অবাক। বিছানার পাশে রাখা চেয়ারটায় ধীরে ধীরে তিনি বসলেন। তিস্তা বলল, 'অনেকদিন আগে একবার আমার জণ্ডিস হয়েছিল। আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। যখন প্রায় ভাল হয়ে উঠেছিলাম তখন তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলে। আমি সেদিন জবাব দিতে পারিনি। বলেছিলাম পরে দেব। তুমি আমাকে কি জিজ্ঞাসা করেছিলে মনে আছে বাবা ?'

ভদ্রলোক চুপচাপ মেয়েকে দেখছিলেন, এবার মাথা নেড়ে না বললেন।

'আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে যে শিক্ষায় আমি বড় হয়েছিলাম তাতে কি করে অমন করেছিলাম। বাবা, আমি এখনও বুঝতে পারি না কেন ভুল হয়। কেন আমি পুরুষমানুষের কাছে বারংবার প্রতারিত হই! একজন পুরুষ যখন স্বামী বা প্রেমিক তখন সে যেরকম বাবা হলে সে পাল্টে যায় কি? বাবা, তুমি তো পুরুষমানুষ, তুমি কোন নারীকে কি প্রতারণা করেছ?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তিস্তা চোখ সরাচ্ছে না। যেন এই প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত ওইভাবে অপেক্ষা করবে। বাবা বললেন, 'মানুষের ধর্ম হল নিজের স্বপক্ষে কথা বলা। আমাকে যে সবচেয়ে বেশীদিন ধরে জানে তাকে জিজ্ঞাসা কর।'

'তুমি মায়ের কথা বলছ?'

'এ ছাড়া আর কে আছে!'

'কিন্তু মায়ের সঙ্গে তোমার অনেক অমিল।'

'ওই তো সত্যি কথা বলতে পারবে।'

'বাবা, আমি বুঝতে পারি না।'

'কি হয়েছে তোর?'

'বাবা, তুমি আমার পাশে এসো। এইখানে।' হাত বাড়াল তিস্তা।

তিস্তার বাবা বিছানায় উঠে বসে মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন, 'কি হয়েছে মা?'

'বাবা, আমি আবার ঠকে গেলাম।'

'ঠকে গেলি?'

'হ্যাঁ। আমার কোন লিগ্যাল স্ট্যাটাস নেই। আমি, আমি জাস্ট রক্ষিতা।'

'কি বলছিস তুই?' চিৎকার করে উঠলেন বৃদ্ধ।

'হ্যাঁ বাবা। অরিত্রর আগের বিয়ে এখনও আইনসম্মত। ওদের ডিভোর্স হয়নি।'

'মাইগড! ও তাহলে বিয়ে করল কি করে?'

'আমি জানি না, কিস্যু জানি না। আমার কথা ভাবি না, টিয়ার কি হবে?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। দাঁড়া। অরিত্র, অরিত্র,?' বৃদ্ধ ডাকলেন।

অরিত্র ঘরে এল। মুখ গম্ভীর। বৃদ্ধ বললেন, 'ও কি বলছে?'

'হ্যাঁ বাবা। ঠিকই। কিন্তু তিস্তা একটু বেশী আপসেট হয়ে পড়েছে।'

'তুমি কি বলছ?'

'আসলে আমি সত্যি কথাটা বলতে পারিনি কারণ ওকে হারাতে চাইনি। সেদিন ওকে যেমন ভালবাসতাম আজও তেমনই ভালবাসি। আমার আগের বিয়ে বাতিল হল কি হল না তাতে কি যায় আসে। স্বামী হিসেবে আমি তিস্তার পাশে আছি আন্তরিকভাবে। আর, আর রিস্ক তো আমারই বেশী।'

'মানে?'

'আমার বিরুদ্ধে নালিশ পেলে পুলিশ আমাকে এ্যারেস্ট করবে। এটা আমার অজানা ছিল না। তবু কেন এমন ঝুঁকি নিয়েছিলাম তা তিস্তাকে ভাবতে বলছি।'

'তোমার লোভ, লোভের জন্যে মিথ্যে বলেছ তুমি। সেদিন ভেবেছিলে নীলিমা কথা রাখবে। কখনও বিরক্ত করবে না। তুমি গায়ে হাওয়া লাগাতে পারবে।'

'হ্যাঁ। এখন এমন ব্যাখ্যা করা যায়।'

তিস্তার বাবা মাথা নাড়লেন, 'কি অন্যায় করেছ ভাবো। এই বিয়ে যদি আইনের স্বীকৃতি না পায় তো টিয়ার কি হবে?'

'আমি বুঝতে পারছি না। আমি মরে যাইনি, টিয়ার সঙ্গে আছি এবং থাকব থাকব। ওর বাবা বেঁচে থাকতে কেন আপনারা এসব ভাবছেন?' অরিত্র গলা তুলল।

'বাবা ঠিকই বলেছেন। নীলিমাকে ডিভোর্স না করলে আমি আর তোমার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে পারব না।'

'নীলিমা সেটা দিতে রাজী হয়নি।'

'আমি জানি না। যেমন করে হোক রাজী করাও।'

'তারপর?'

'তারপর আমরা আবার বিয়ে করতে পারি টিয়ার জন্যে।'

'যদি তোমার পরিকল্পনা মত সব ঠিকঠাক করতেও পারি তবু তাতে একটা অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে না কি?'

তিস্তার বাবা বললেন, 'তিস্তা তো ঠিকই বলছে।'

'না। ঠিক বলছে না। আমাদের বিয়ের সময় টিয়ার বয়স কত হবে?'

তিস্তা মাথা চাপড়ালো, 'ওঃ, ভগবান।'

অরিত্র বলল, 'তা ছাড়া ডিভোর্স পেতে সময় লাগবে। নীলিমা কনটেস্ট না করলেও। যেমন ছিল তেমন থাকলেই—।'

'না।' তিস্তা চেঁচিয়ে উঠল, 'তেমন থাকবে না। আমি তোমার রক্ষিতা নই অরিত্র। বাবা, তুমি একজন ল-ইয়ারের খবর নাও। আমি দেখা করব।'

বাবা উঠে দাঁড়ালেন, 'তোর কি পুলিশের কাছে যাওয়ার ইচ্ছে আছে?'

'ল-ইয়ার যা বলবেন!'

'তুই কি আমার সঙ্গে যাবি?'

'এখন না।'

'কেন?'

'টিয়ার দিকে তাকাতে পারব না।'

'তুই বিকেল চারটের সময় বারাকপুর স্টেশনে আয়। আমি দেখছি।' বৃদ্ধ বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই অরিত্র তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'বাঃ। আপনি মেয়েকে শেষপর্যন্ত এই বোঝালেন?'

বৃদ্ধ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। 'দ্যাখো অরিত্র।' আমি পুরোন দিনের মানুষ। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না কোন মেয়ে কোন ছেলের থেকে একটুও কম। আমার মেয়েকে যেভাবে বড় করেছিলাম তাতেও সে দু-দুবার ভুল করল। তুমি ওকে প্রতারণা করে যে অবস্থায় নিয়ে গিয়েছ তাতে এখন আর কিছু বলার মুখ নেই। তিস্তার উচিত থানায় গিয়ে তোমার নামে ডায়েরি করা। কিন্তু টিয়ার কথা ভাবতে হচ্ছে আমাদের।'

অরিত্র বলল, 'আমি সব বুঝতে পারছি, কিন্তু আপনারা আমাকে সময় দেবেন না ?'

'সময় ? কেন ?'

'আমি এখন অনেক বছর নীলিমার সঙ্গে থাকি না। এইটে ডিভোর্স পেতে আমাকে সাহায্য করবে। আমাকে এটা করতে দিন।'

'আশ্চর্য। তোমার প্রথম স্ত্রী সেটা তো দিতে চান না। আজ চাইবেন কেন ?'

'সেটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'ঠিক আছে। তুমি তোমার মত দ্যাখো। তাড়াহুড়ো করে কোন লাভ নেই। তবে তিস্তারও জানা দরকার সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে।' বৃদ্ধ মেয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আমি তোর জন্যে বারাকপুর স্টেশনে অপেক্ষা করব মা।'

অরিত্র ওঁকে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে এসে বলল, 'ভদ্রলোককে এসব কথা না বললেই চলত না ? এটা তোমার আমার ব্যাপার !'

তিস্তা বলল, 'আমাকে বিরক্ত করো না।'

'বাড়িতে রান্না হবে না ?'

তিস্তা জবাব দিল না। অরিত্র চেষ্টা করল কাজের মেয়েটিকে দিয়ে কিছু খাবার তৈরী করিয়ে নিতে। তারপর রোজকার মত সে ঠিকঠাক অফিসে বেরিয়ে গেল। এতবড় একটা ঝড় বয়ে গেল অথচ ওর জীবনযাপনে কোন পরিবর্তন নেই। তিস্তার মনে হচ্ছিল সে যে.কত বড় বোকা তা অরিত্র তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। গতকাল সকালেও অরিত্র ছিল তার স্বামী। এই মুহূর্তে আর সেই সম্পর্কটাকে মানতে পারছে না। কেন ? শুধু বিয়েটা বাতিল হয়ে গেল বলে ? না নীলিমার দর্পভরা কথাগুলোর জন্যে। ওর করুণায় তাকে থাকতে হবে এখন থেকে'। কি করতে পারে নীলিমা ? পাঁচজনকে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলবে তাদের বিয়ে অবৈধ ? বলুক। বিয়ের সার্টিফিকেটটা তো ছিঁড়ে ফেলতে পারবে না। ওই মুহূর্তে যেটা সত্যিভাবে গ্রহণ করেছিল সেটা তো সারা জীবনের সত্যি।

বারাকপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুই যেতে পারবি তো ? শরীর কেমন লাগছে ?'

'ঠিক আছি।' গম্ভীর গলায় জবাব দিয়েছিল সে।

আর তার এক ঘণ্টা বাদে দমদমের এক ল-ইয়ারের চেম্বারে বসে তিস্তা চোখ বন্ধ করল স্বস্তিতে। সত্যব্রতবাবু বলছিলেন, 'এখন আইন পাল্টে গেছে। আপনার মেয়ে আর কোন অবস্থাতেই জারজ সন্তান নয়। নার্সিংহোমের সার্টিফিকেটে তার বাবার নাম আছে, এই নামটা আপনাদের ম্যারেজ সার্টিফিকেটেও পাওয়া যাবে। সুতরাং ওর জন্ম আইনসম্মত। যদি বিয়েটা নাও হতো তবু পিতৃত্ব প্রমাণ করতে পারলে আজকাল যে কোন সন্তান লিগ্যাল রাইট পেতে বাধ্য। মিসেস সেন, আপনার মেয়ে অবৈধ সন্তান নয়।'

তিস্তার বাবা বললেন, 'অনেক উপকার করলেন কথাটা বলে। কিন্তু আমার

মেয়ের কি হবে ?'

সত্যব্রতবাবু বললেন, 'তিনটে পথ আছে। এক আপনি পুলিশকে জানাতে পারেন। প্রবঞ্চনা ও দ্বিতীয় অবৈধ বিয়ের জন্যে ওর জেল হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছু লাভ হচ্ছে না। দ্বিতীয় পথটা হল, মিস্টার সেন তার আগের স্ত্রীকে যেকোন ভাবে ডিভোর্স করুন। এটা উনি পারবেন না। করতে গেলে তাঁকেই জেলে যেতে হবে। তৃতীয় পথটাই সহজ। আপনারা স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে কোর্টের কাছে আবেদন করুন বিবাহ-বিচ্ছেদের। যৌথ আবেদন করলে ওই বিয়ে বাতিল হতে পারে। তারপর মিস্টার সেন আগের স্ত্রীর বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা আনুন। তখন তিনি মুক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে আর কেস টিকবে না। ইতিমধ্যে অনেক বছর আলাদাও থেকেছেন, ডিভোর্স পেলে তিনি আবার আপনাকে বিয়ে করতে পারেন। আপনাদের বিয়েটাকে বাতিল করতে আর একটা পথ আছে। সাধারণত সই করা বিয়েতে সবসময় প্রত্যেকটা নিয়ম ঠিকঠাক মানা হয় না। নোটিসের সময় কম থাকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই। সেইরকম একটা কারণ দেখিয়ে বিয়েটা বাতিল করলে মিস্টার সেনের প্রথম স্ত্রী কোন অভিযোগই আনতে পারবেন না। তবে এসব করার আগে একটা দলিলে ভদ্রলোককে সই করতে হবে। তিনি এখনই লিখিতভাবে নিজের মেয়ের নামে তার যাবতীয় সম্পত্তির অর্ধেক লিখে দেবেন। উনি রাজী হবেন ?'

তিস্তার বাবা বললেন, 'মনে হয় আপত্তি করবেন না।'

'তাহলে আমি কাগজপত্র তৈরী করে রাখব। আপনি তিনদিন পরে ওঁকে এখানে নিয়ে এসে সইসাবুদ করে যাবেন।'

তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা আলাদা থাকতে পারি?'

'অবশ্যই। মিউচুয়াল হলেও আপনার আলাদা থাকা দরকার।'

'আমার কোন স্বীকৃতি নেই, না ?'

'কে বলেছে নেই। বিয়ের সার্টিফিকেট আপনার কাছে আছে। ওই বিয়ে আইনসঙ্গত বলেই আপনি জানেন। ডিভোর্সটা হবে। সেটাও আপনার স্বীকৃতি। আর কি চাই ?'

ফিরে আসার সময় তিস্তার বাবা বললেন, 'তাহলে শ্যামনগরে চল।'

'আজ নয়।'

'কেন ?'

'আজ ওর সঙ্গে কথা বলব।'

বৃদ্ধ আর কথা বাড়াননি।

শুধু অপমানবোধ ছাড়া অন্য কোন অনুভূতি নেই। বুকের ভেতর ভার হয়ে আছে সেই অনুভূতি। নিজেকে নষ্ট করতে ছিবড়ে করে দিতে যে ইচ্ছেটা প্রবল হচ্ছিল সেটা যেন নিস্তেজ। রাত গভীর হলে অরিত্র ফিরল।

ঘরে ঢুকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ?'

তিস্তা যা শুনেছে বলে গেল।

অরিত্র বলল, 'বেশ তাই হবে।'

'তুমি বেঁচে যাবে। আমাদের বিয়েটা বাতিল হয়ে গেলে আমি অথবা

নীলিমা আর তোমাকে বিপদে ফেলতে পারব না।'

'হয়তো। কিন্তু এর ফলে আমি নীলিমার কাছ থেকে মুক্তি পাব।'

'তারপর ?'

'আমি সিনসিয়ারলি যা চাই, তোমার সঙ্গে সম্পর্কটাকে আইনসঙ্গত করে নেব। টিয়াকে ছেড়ে থাকতে পারব না আমি।'

'তুমি কি এই বাড়ি রাখবে ?'

'কেন ?'

'আমি কাল শ্যামনগরে চলে যাব।'

'ও। না। আমার পক্ষে একা থাকা সম্ভব নয় এখানে।'

'কোথায় থাকবে জানিয়ে দিও।'

'আমি তো শ্যামনগরে যাবই।'

'না।'

'না মানে ?'

'যতদিন তুমি নীলিমার কাছ থেকে মুক্তি না পাচ্ছ ততদিন ওখানে যাবে না!'

'সে কি ? টিয়াকে দেখতে পাব না ?'

'না।'

'এতে তো সময় লাগবে।'

'লাগুক। তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।' তিস্তা হাসল, অনেকক্ষণ পরে হাসি এল, 'তুমি তো টিয়ার জন্মানোর খবরে খুশী হওনি।'

'ওঃ। ওটা একটা সাময়িক প্রতিক্রিয়া।'

'জানি না। তোমাকে যোগ্য হতে হবে।'

রাত আরও বাড়ল। অরিত্র আজ পাশের ঘরে। হঠাৎ তিস্তার মনে কথাটা এল। টিয়া শরীরে আসার পর থেকে অরিত্র যে আচরণ করেছে, যে শীতলতা দেখিয়েছে সেটা কি ওর অপরাধবোধ থেকে তৈরী হয়েছিল ? ও কি ভেবেছিল সেই সন্তান জারজ হবে ? নিজেকে গুটিয়ে নেবার তো অন্য কোন কারণ নেই। তিস্তার মনে হচ্ছিল অরিত্র তাকে দু-দু'বার প্রবঞ্চনা করেছে।

আজ চোখে ঘুম নেই। কিন্তু অদ্ভুত এক স্বপ্নের ঘোরাফেরা আছে চোখে। তারা আলাদা হল। অরিত্র আর তার কেউ নয়। অরিত্র নীলিমার বিরুদ্ধে মামলা করল। ধরা যাক জিতেও গেল। তারপর একদিন এল তার কাছে ফিরে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। সেই দিনটার জন্যে অপেক্ষা করবে সে। এখন প্রতিদিনের বেঁচে থাকা সেই মুহূর্তের জন্যে। খুব স্পষ্ট গলায় সে জবাব দেবে, 'না। আর নয়।'

সারা শরীরে না শব্দটিকে নীরবে বহন করতে লাগল তিস্তা। শুধু নির্দিষ্ট সময়ে সেটি ছুঁড়ে দিলে যে বিস্ফোরণ হবে তার নাম পুনর্জন্ম।

শামনগর থেকে শেয়ালদা আর কতদূর ? রাণাঘাট, কল্যাণী কিংবা নৈহাটি ধরলে হুস করে চলে আসা। কিন্তু ট্রেনগুলো যখন প্ল্যাটফর্মে এসে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে দাঁড়ায় তখন প্রায়ই এক অদ্ভুত হতাশায় আক্রান্ত হয় তিস্তা। মানুষে মানুষে ঠাসাঠাসি কামরাগুলোয় কোথাও এক চিলতে ফাঁক নেই।

প্ল্যাটফর্মের ঠিক যে জায়গায় লেডিস কামরা এসে দাঁড়াবে সেটাও এখন জানা। নৈহাটি লোকাল ছাড়া সেটার অবস্থা একই রকম। প্রথম প্রথম ট্রেন ছেড়ে দিত সে। পরেরটার জন্যে অপেক্ষা করত বাধ্য হয়ে। ফলে অফিসে পৌঁছাতে যথেষ্ট দেরিতে। কথা শুনতে হত। আর তা থেকেই মরীয়া ভাবটা মনে এল। আপাতচোখে যেখানে তিলমাত্র জায়গা নেই সেদিকেই ছুটে যাওয়া। কোনমতে হাতল আঁকড়ে ধরলে জমাট ভিড় তাকে গিলে নেবেই। শারীরিক সংঘর্ষের জন্যে যে সংকোচ এতদিন ছিল প্রয়োজনের চাপে তা ওই মুহূর্তে উধাও। যাতায়াত ঠিক সময়ে করতে হলে তোমাকে লড়াই করে যেতে হবে। আর সেই ঠাস মানুষের দঙ্গলে দাঁড়িয়ে এক ফোঁটা বাতাসের জন্যে সবাই যখন আকুলি বিকুলি করে তখন তিস্তার মনে হয় ঈশ্বর মানুষের সহ্যশক্তির কাছে নিজেই পরাজিত হয়েছেন।

শেয়ালদায় নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাওয়া মানুষের মধ্যে যেন সাঁতরাতে সাঁতরাতে তিস্তাকে সার্কুলার রোডে পৌঁছে ট্রাম কিংবা বাসের প্রতীক্ষায় থাকতে হয় যেটা তাকে অফিসে পৌঁছে দেবে। গলদঘর্ম হয়ে যখন অফিসের চেয়ারটায় সে বসতে পারে তখন নিজেকে ছিবড়ে মনে হয়। শরীর এমন কাহিল যে মনের কোন কষ্টই আর তীব্র হয় না। মাঝে মাঝেই মনে হয় যে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ পেটের খিদে মেটাতে দিনরাত পরিশ্রম করতে বাধ্য হয় তাদের মানসিক যন্ত্রণা অনেক কম। হয়তো দেখা যাবে তারা হৃদরোগে আক্রান্ত কদাচিৎ হয়।

প্রাথমিক ঝিমুনি কাটিয়ে কাজে ডুবে যেতে হয় তিস্তাকে। প্রতিমুহূর্তে মানুষ আসছে তাদের কাছে। এইসব মানুষেরা ক'দিনের জন্যে কলকাতা থেকে পালাতে চায়। বকখালি পারমাদান থেকে হলং দার্জিলিং, একটু জায়গা করে দিলেই যেন মুক্তির আনন্দ। প্রতিদিন এমন বেড়াতে উন্মুখ মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে তারও মনে হয় কোথাও গেলে হত। আর এমনটা মনে এলেই কষ্ট। তার পক্ষে আর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। গত হেমন্তে বাবা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন। অনেক চেষ্টায় তাঁকে এখন ঘরের মধ্যে লাঠি হাতে হাঁটানো সম্ভব হয়েছে। টিয়া এবার তিনে পড়বে। ওর জন্যে স্কুলের ব্যবস্থা করে রেখেছে মা। আর এদের সঙ্গে জড়িয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হবে। যতই মনে হোক এভাবে উদ্দেশ্যহীন বেঁচে থেকে কি লাভ তবু এ থেকে পরিত্রাণও নেই।

উদ্দেশ্যহীন শব্দটিতে প্রবল আপত্তি আছে মায়ের। টিয়াকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার পর তিস্তার যে দায়িত্ব বেড়েছে তাতে জীবন উদ্দেশ্যহীন বলা আর ঠিক নয়। টিয়াকে মানুষ করাটাই এখন অন্যতম উদ্দেশ্য হতে পারে।

কেন ? মাঝেমাঝে প্রশ্নটা মনে চলে আসে তিস্তার। কেন টিয়াকে মানুষ করার দায়িত্ব শুধু তাকেই বহন করতে হবে ? পৃথিবীর আদিকাল থেকে পুরুষেরা এই দায়িত্ব নারীদের ওপর ছেড়ে দিয়ে যেন ধন্য করেছে। মা এবং সন্তান নামক সম্পর্কটিকে আরও সেন্টিমেন্টাল করে সেই দায়িত্ববোধকে গভীরতর হতে সাহায্য করেছে। এসবই পুরুষেরা করেছে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে। টিয়ার দিকে তাকালে মাঝে মাঝেই একটা অস্বস্তি

হয় তার। বড় হয়ে এই মেয়েও তার সঙ্গে ওর বাবার মত মিথ্যাচার করবে না তো ! হামাগুড়ি, টলটলে পায়ে হাঁটার পর্বগুলো পেরিয়ে এসেছে টিয়া। তার দিমা তাকে বুঝিয়েছে বাবা অনেক দূর দেশে গিয়েছে। ওইটুকুনি মেয়ে বাবার ছবি দেখে আজকাল গাল ফোলায়। অভিমান মেয়েরা জন্মমাত্র আয়ত্ত করে ফেলে বোধহয়।

অরিত্র এই সময়ে বেশ কয়েকবার টেলিফোন করেছে তিস্তাকে। টিয়ার খবর জানতে চেয়েছে। তিস্তা একেবারে নিস্পৃহ গলায় যতটুকু বলার ততটুকু বলেছে। অরিত্র শামনগরে যেতে চাইলে সে স্পষ্ট নিষেধ করেছে। মেয়েকে দেখার জন্যে অরিত্র যতই ছটফট করুক তিস্তা এখন অনুমতি দিতে পারে না। তিস্তার বাবার শরীরের অবস্থার জন্যে দায়ী যে তাকে ওই বাড়িতে সে ঢুকতে দেবে কেমন করে ! তাছাড়া যতক্ষণ অরিত্র নীলিমার কাছ থেকে ডিভোর্স না পাচ্ছে ততক্ষণ টিয়ার সঙ্গে দেখা করার কোন অধিকার পাবে না।

এসব চাপ নিয়েই বেঁচে থাকা। অরিত্র এখন কোথায় থাকে সে-খবরও তার জানা নেই। নীলিমা তাকে ডিভোর্স দিতে সম্মত হয়েছে এমন একটা কথা একবার ফোনে বলেছিল। খবরটা সত্যি কিনা তাও জানা নেই। আজকাল কোন কিছুকেই সহজ ভাবে নিতে অস্বস্তি হয়। অরিত্র বলেছে নীলিমা ডিভোর্স দিতে পারে যদি সে একটা বড় অঙ্কের টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়। টাকাটা জোগাড় করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে অরিত্র। কিন্তু যে করেই হোক জোগাড় সে করবেই। কদ্দিনে করবে কিভাবে করবে তা জানতে চায়নি তিস্তা। হয়তো এ জীবনে নয়। হয়তো ওই মুক্তিপ্রাপ্ত জীবন অরিত্র নষ্ট করবে না। এখন তো আর জেলে যাওয়ার ভয় নেই।

মুক্ত তো তিস্তাও। সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত। আঠারো বছরে যে প্রেমের আবেগ তাকে দিশেহারা করেছিল জীবন তার অন্য চেহারা দিল। এখন পেছন দিকে তাকালে শুধুই হতাশা, নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসা। জীবনের শুরুতে যেসব স্বপ্ন চোখে থাকে, যে পদ্ধতিতে নিজেকে গড়ে তোলার সময় ভবিষ্যতের ছবি চোখে আঁকা হয় তার সঙ্গে যাপিত হওয়া জীবনের কোন মিল নেই।

তবু এক একদিন হঠাৎ ঘুম ভাঙা ভোরে ছাদে উঠে পাতলা হয়ে আসা অন্ধকারে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে তিস্তার ভাল লাগা বোধটা ফিরে আসে। হঠাৎ মাঝরাত্তিরে টিভিতে পথের পাঁচালি দেখতে দেখতে মনে সুর জেগে ওঠে, ঘুমন্ত টিয়ার গায়ের গন্ধে নিজের শৈশব চমৎকার ফিরে আসে আর তখনই মনে হয় আগামীকালের জন্যে আজ বেঁচে থাকতে হবে।

নিজেকে খুব ভালবাসতে ইচ্ছে করে তখন।